লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৫ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক আহ্‌মদী

ঈদুল আযহা সংখ্যা

The Ahmadi Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮০ বর্ষ | ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ ভাদ্র, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ | ৮ জিলহজ্ব, ১৪৩৮ হিজরি | ৩১ যহুর, ১৩৯৬ হি. শা. | ৩১ আগস্ট, ২০১৭ ঈসাব্দ

যুক্তরাজ্যের ৫১তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
ইউ.কে. জামা'তের ন্যাশনাল আমীর জনাব রফিক আহমদ হায়াত সাহেব

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) প্রণীত

‘শরায়াতে বয়আত অওর আহমদী কি যিম্মাদারীয়া’

পুস্তকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে

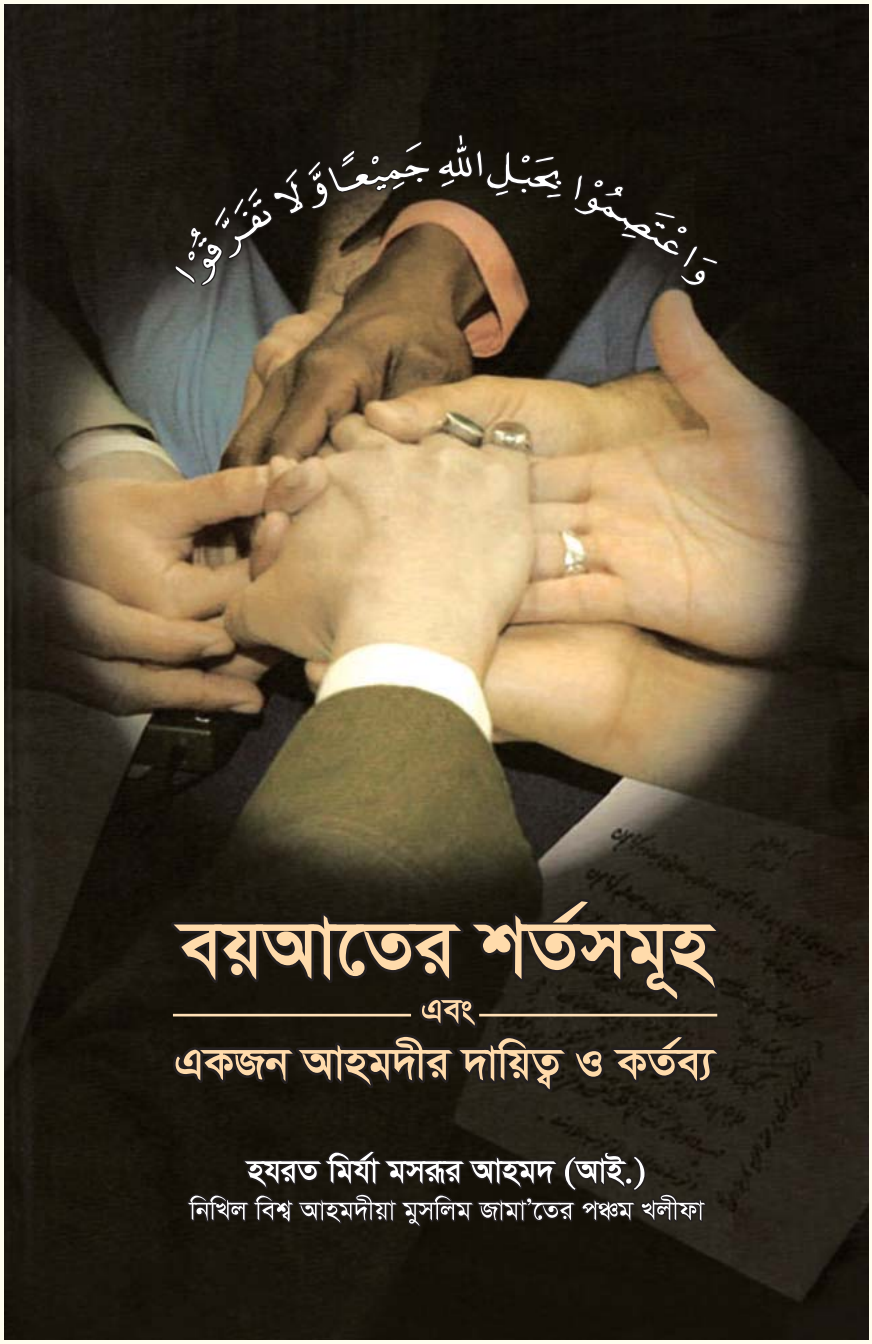

পুস্তকটি সম্পর্কে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দিক নির্দেশনা (ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত)

আমরা যারা ইমাম মাহদী (আ.) বা তাঁর খলীফার নিকট বয়আত গ্রহণ করি তারা এই শর্তগুলো পড়ে থাকি- সাধারণভাবে এর অর্থ বুঝতে পারি কিন্তু এর যে তত্ব ও মাহাত্ম্য তা অনুভব করতে পারি না। যদি আমরা এর মাহাত্ম অনুভব করতে পারি তাহলে এই শর্তগুলো প্রতিপালনে আমাদের ঐকান্তিকতা ও আগ্রহ এবং ইচ্ছা শক্তি আরো বেগবান হয়ে যাবে।

পুস্তকটি প্রত্যেক আহমদীর জন্য একটি গাইড বুক বিশেষ। হুযূর (আই.)-এর মমতা মাখা এ পুস্তকটি থেকে উপকৃত হতে আমাদের সকলের প্রচেষ্টারত থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা’লা স্বীয় সন্তুষ্টির চাদরে আমাদের আচ্ছাদিত হওয়ার সৌভাগ্য দানে কৃপাধন্য করুন। আমীন।

নিবেদক

মোবাশশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত,
বাংলাদেশ

আপনার কপি সংগ্রহ করেছেন কি?

সম্পাদকীয়

কল্যাণমণ্ডিত ইব্রাহিমী কুরবানীর চলমান ধারায় শান্তিময় হয়ে উঠুক গোটা বিশ্ব

চার হাজার বছর কালেরও পূর্বে হযরত ইব্রাহীম (আ.) খোদা তা'লার আদেশে তাঁর প্রথম পুত্র হযরত ইসমাঈল(আ.)-কে জনমানব শূন্য, তরুলতাহীন মক্কার মরু প্রান্তরে ছেড়ে যান, যেখানে জীবন-যাপনের কোন উপকরণই ছিল না। এটি ছিল তাঁর সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন, যাতে তিনি (আ.) নিজ পুত্রকে জবাই করতে দেখেছিলেন। খোদা তা'লা পুত্র কুরবানীর স্থলে বাহ্যিকভাবে পশু কুরবানীর আদেশ করলেন আর এভাবে পূর্ব-প্রচলিত 'নরবলি'-র কুপ্রথাও বাতিল হল । প্রকৃতপক্ষে এটিই ছিল আত্মোৎসর্গের মর্মানুযায়ী 'প্রথম মানব-সন্তান ওয়াক্‌ফকরণ' অর্থাৎ নিজ সন্তানকে খোদার পথে উৎসর্গ করে দেয়া ।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) আর হযরত ইসমাঈল(আ.)-এর এই কুরবানী আল্লাহ তা'লা কবুল করে একে এতটাই কল্যাণমণ্ডিত রূপে ভূষিত করলেন যে, তাঁর পুত্র ইসমাঈল(আ.)-এর প্রজন্ম ধারায় বিশ্ব ধর্ম-বিধানের বাহক, শ্রেষ্ঠ আদমসন্তান, নবীকুলের গৌরব হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাব ঘটলো।

হজ্জ পালনকালে পশু কুরবানী হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানীরই বাহ্যিক এক প্রতীকি প্রকাশ হলেও এদ্বারা অতুলনীয় সেই কুরবানীর স্মৃতিই চির অম্লান হয়ে রয়েছে। তাঁর পবিত্র বংশ–বাহ্যিকভাবে বিরান মক্কা উপত্যকায় সেই অনুপম ফল দান করলো, যার ফুঁৎকারে পৃথিবীতে আধ্যাত্মিকতা সজীব হলো, আজও সজীব আছে এবং চিরকাল সঞ্জীবিত হতে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে,পবিত্র ঈদুল আযহিয়া হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত ইসমাঈল (আ.) ও হযরত হাজেরা (রা.) সহ, এই মহান ব্যক্তিবর্গের আত্ম-ত্যাগের আদর্শকে ধারন করে মানবজাতিকে আল্লাহ তা'লার নৈকট্যলাভের পথ দেখিয়ে চলছে । কিন্তু আফসোস! জড়-জগতের উন্নতির এ যুগে আধ্যাত্মিক অন্ধত্বের কারণে মানুষ এই মহান কুরবানীর আদর্শকেও অনুষ্ঠান-সর্বস্বে পরিণত করেছে।

ঈদুল আযহিয়ার নামায আদায় শেষে পশু জবাই করে শরীয়তের বিধান মতে এর গোশত বন্টন করে সবাইকে মাংস খাওয়ার আনন্দে শামিল করা এক ইবাদতও বটে। হযরত রসূল করীম (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর যুগে এরকম ঈদই পালিত হতো। ওই রূপ ঈদ পালনই মানুষের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধতা ও তাক্‌ওয়া হাসিলের কারণ হয়। এতে পরস্পরের মাঝে ঈমানী-ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা দূর হয়ে স্বর্গীয় এক পরিবেশে চরম ও পরম আনন্দ অনুভূত হয়, আর এরই নাম প্রকৃত ঈদ।

সেই সাথে মহান আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিশেষ শুকরিয়া আদায় করি যে, তিনি একান্ত দয়াপরবশ হয়ে আমাদের মাঝে খিলাফতে হাক্কা ইসলামীয়া আহমদীয়া-র নিয়ামত শত বছরাধিক কাল ধরে জারি রেখে আমাদেরকে বিশেষভাবে অনুগৃহীত করেছেন। আর আহমদীয়া খিলাফতের তাহরীক 'ওয়াকফে নও' স্কীমের আওতাভুক্ত পিতা-মাতা ও সন্তানেরা ইব্রাহিমী কুরবানীর সেই ধারা সচল রাখার সৌভাগ্য লাভ করে চলছেন, আলহামদুলিল্লাহ্! আমাদের বিনীত দোয়া হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর আশিসময় ছায়া আমাদের ওপর সদা বিরাজমান থাকুক আর আহমদীয়াত তথা খাঁটি ইসলাম বিস্তার লাভ করে জগৎময় শান্তির সুবাতাস ছড়িয়ে দিক।

আমাদের সকলকে খোদা তা'লা প্রকৃত অর্থে ঈদুল আযহিয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইব্রাহিমী কুরবানীকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করে উক্ত আদর্শ ধারনের তৌফিক দান করুন। আমীন!

বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানো হুকুকুল ইবাদেরই অংশ

গত কিছুদিন ধরে দেশের উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলা বন্যায় কবলিত হয়ে লাখ লাখ মানুষ পানি বন্দি হয়ে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অসংখ্য পরিবার। তলিয়ে গেছে হাজার হাজার হেক্টর জমির ফসল, বন্যার পানিতে তলিয়ে আছে শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও। সুপেয় পানি ও খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে প্রকট আকারে। বন্যায় অনেক দরিদ্র পরিবারের বাড়িঘর, সহায়-সম্পদ যা ছিল সবই শেষ হয়ে গেছে। এসব ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের সাহায্য করা ইসলামেরই শিক্ষা। আর এরই মাধ্যমে আল্লাহপাক বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। বন্যায় বেশ কিছু সংখ্যক মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে আর মারা গেছে বহু গবাদিপশু। আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বিপুল।

এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুর্যোগ কবলিত লোকদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো আমাদের মানবিক দায়িত্ব। আমাদের সবার একটু সহযোগিতার ফলে একটি পরিবার ফিরে আসতে পারে স্বাভাবিক জীবনে। বন্যার কারণে তারা যা হারিয়েছে, হয়তো তা আমরা পুরণ করতে পারবো না। কিন্তু তাদের জন্য যদি আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই তাহলে হয়তো তারা সব হারানোর বেদনা থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবে। আমরা কী পারি না এই সব দুর্যোগ কবলিত লোকদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে? আমরা কী পারি না তাদের দু:খের দিনে বন্ধু হতে? মানুষ হিসেবে কী আমাদের উপর এই দায়িত্ব বর্তায় না যে আমরা তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করি? সমাজের বিত্তবান, সচ্ছল নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে বিনীত আবেদন, আসুন! আমরা আমাদের সাহায্যের হাত প্রসারিত করি।

এছাড়া বন্যা কবলিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন যারা, করুণাময় আল্লাহ তা'লা তাদের সকলকে রহমতের চাদরে আচ্ছাদিত রাখুন, আর শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে ধৈর্য্য ধারণের তৌফিক দান করুন।

কুরবানীর অনুপ্রেরণা নিয়ে সবাইকে জানাই-

ঈদ মুবারক

সূচিপত্রে

১৫ ও ৩১ আগস্ট, ২০১৭

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া' (৩য় খণ্ড) ৬
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

এযালায়ে আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ৯
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২০ জানুয়ারি, ২০১৭ **জুমুআর খুতবা** ১১

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৭ জানুয়ারি, ২০১৭ **জুমুআর খুতবা** ১৯

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) প্রদত্ত **১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ঈদুল আযহার খুতবা** ২৮

ঈদ-উল-আয্‌হিয়ার কুরবানী আল্লাহ তা'লার নৈকট্যলাভের উৎকৃষ্ট বাহন ৩৩
মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

ইসলামের জীবন বাঁচাতে এখন ইসমায়িলী কুরবানী প্রয়োজন ৩৫
কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

কুরবানীর প্রকৃত তাৎপর্য ৩৮
মওলানা মোহাম্মদ সোলয়মান

বায়তুল্লাহ নির্মাণ সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যের সাথে মহানবী (সা.)-এর গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান ৪১
হযরত খলীফাতুল মসীহ আস্ সালেস (রাহে.)

বিশ্বশান্তি : সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান ৪৬
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

কলমের জিহাদ ৪৮
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

আমি কিভাবে আহমদী হলাম ৫০
মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান (সিদ্দীকী)

যুক্তরাজ্যের ৫১তম সালানা জলসার সমাপ্তি ৫৩

সংবাদ ৫৮

আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ করুন ৬৪

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ
هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿۱۲۶﴾

১২৬। তুমি প্রজ্ঞা[১৫৮৮] ও সদুপদেশের মাধ্যমে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান জানাও। আর তুমি সর্বোত্তম যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে [ঙ]তাদের সাথে বিতর্ক কর। [চ]নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই তাদের সবচেয়ে ভালো জানেন যারা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। আর তিনি হেদায়াতপ্রাপ্তদেরও সবচেয়ে ভালো জানেন।

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا
عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ؕ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ
خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۲۷﴾

১২৭। [ক]আর তোমরা (অত্যাচারীদের) শাস্তি দিতে চাইলে ততটুকুই শাস্তি দিও যতটুকু অন্যায় অত্যাচার তোমাদের উপর করা হয়েছে। তবে [খ]তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য এটাই তো উত্তম।

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا
تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ
مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿۱۲۸﴾

১২৮। আর তুমি ধৈর্য ধর। আর তোমার ধৈর্য ধারণ কেবল আল্লাহরই জন্য। আর [গ]তুমি তাদের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মুষড়ে পড়ো না।

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ
هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ﴿۱۲۹﴾ ع ۱۶

১২৯। [ঘ]নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ[১৫৮৯]।

১৫৮৮। 'হিকমত' অর্থ : (১) প্রজ্ঞা, জ্ঞান অথবা বিজ্ঞান, (২) সাম্যবাদিতা বা ন্যায়-বিচার, (৩) ধৈর্য বা ক্ষমাশীলতা, (৪) অবিচলতা, (৫) যা সত্যের সমার্থক বা সত্যসম্মত এবং যা অবস্থার প্রেক্ষিতে জরুরী বিবেচিত, (৬) নবুওয়তের দান বা নেয়ামত এবং (৭) বোকার মতো ব্যবহার করা থেকে যা কোন ব্যক্তিকে বিরত রাখে (লেইন, মুফরাদাত)।

১৫৮৯। 'মুত্তাকী' সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি আল্লাহ তা'লার সঙ্গে এরূপ মজবুত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন, যার ফলে আল্লাহ নিজেই তার রক্ষক হয়ে যান এবং তাকে সবধরনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন। 'মুহসিন' সেই ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি সৎকর্মশীল এবং সুন্দর ও উত্তম ব্যবহারের অধিকারী এবং আল্লাহ তা'লার আশ্রয়ে আসার পর অন্যান্য লোকদেরকেও আল্লাহর আশ্রয়ে টেনে আনার চেষ্টা করেন। এভাবে, যিনি 'মুহসিন' তিনি মুত্তাকী হতে উচ্চতর আধ্যাত্মিক মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন।

হাদীস শরীফ

* নবী করীম (সা.) বলেছেন, হে লোক সকল (জেনে রাখ)! প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রত্যেক বছরই কুরবানী করা আবশ্যক (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

* আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য লাভ করে অথচ কুরবানীর আয়োজন করেনি, সে যেন আমাদের ইদগাহের নিকট না আসে (ইবনে মাজাহ)।

* হযরত আনাস (রা.) বলেন, এক ঈদে রসূলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধুসর রঙ্গের শিংওয়ালা দু'টি দুম্বা কুরবানী করলেন। তিনি এদেরকে আপন হাতে জবাই করলেন এবং (যবাই করার সময়) 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবর' বল্লেন। আনাস (রা.) বলেন, (যবাই করার সময়ে) আমি তাঁকে উহাদের পাঁজরের ওপর নিজের পা রাখতে দেখেছি এবং 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবর' বলতে শুনেছি (মুত্তাফিক আলায়হে)।

* হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর নিমিত্তে বন্টনের জন্য তাকে (উকবাকে) কতগুলি ছাগল-ভেড়া দিলেন। বন্টনের পর এক বছরে একটি বাচ্চা-ছাগল বাকী থাকল। তিনি তা রসূলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উল্লেখ করলেন। হুযূর বল্লেন, তা দ্বারা তুমি নিজে কুরবানী কর। অপর বর্ণনামতে, আমি বল্লাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার ভাগে তো মাত্র একটি বাচ্চা-ছাগল থাকল। হুযূর (সা.) বল্লেন, তুমি তা দ্বারাই কুরবানী কর (মুত্তাফিক আলায়হে)।

* হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদগাহেই যবাই করতেন বা নহর করতেন (বুখারী)।

* হযরত যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক যখন আসে আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন নিজের কেশ ও চর্মের কোন কিছু স্পর্শ না করে (না কাটে)। অপর বর্ণনায় আছে, সে যেন কোন কেশ না ছাঁটে এবং কোন নখ না কাটে। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে এবং কুরবানীর ইচ্ছা রাখবে সে যেন নিজের চুল ও নিজের নখসমূহের কিছু না কাটে (মুসলিম)।

* হযরত আলী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন (কুরবানীর পশুর) চোখ ও কান উত্তমরূপে দেখে নেই এবং আমরা যেন সেই পশু কুরবানী না করি, যে পশুর কানের শেষভাগ কাটা গেছে অথবা যার কান গোলাকারে ছেদিত হয়েছে বা যার কান পশ্চাৎ পৃষ্ঠের দিকে ফিরে গেছে (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী)।

* হযরত আলী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন, আমরা যেন শিং ভাঙ্গা ও কান কাটা পশু দ্বারা কুরবানী না করি (ইবনে মাজাহ্)।

* হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিংওয়ালা খুব বলবান দুম্বা দ্বারা কুরবানী করতেন, যার চোখ কালো মুখ কালো এবং পা কালো (আরবের এরূপ দুম্বাকে খুব সুন্দর বলে মনে করা হয়) তিরমিযী, আবু দাউদ নিসায়ী ও ইবনে মাজাহ্)।

* বনী সুলাইম গোত্রীয় সাহাবী হযরত মুজাশে' থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, ছয় মাস বয়সের ভেড়া এক বছরের ছাগলের স্থান পূর্ণ করে (আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্)।

* তাবেয়ী নাফে (রা.) হতে বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, কুরবানীর দিনের (অর্থাৎ দশই যিলহজ্জের) পরেও দুই দিন কুরবানী চলবে। ইমাম মালেক এটা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হযরত আলী (রা.) থেকেও এমন একটি উক্তি রয়েছে।

* হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেছেন আর বরাবর কুরবানী করেছেন (তিরমিযী)।

* হযরত যায়েদ বিন আকরাম (রা.) বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এই কুরবানী কী? হুযূর উত্তর করলেন, তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামের সুন্নত (নিয়ম) তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এতে আমাদের কি (সওয়াব) আছে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! হুযূর (সা.) বললেন, কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে একটি পুণ্য রয়েছে, তারা আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! পশমওয়ালা পশুদের পরিবর্তে কি পাওয়া যাবে? (এদের পশম তো অনেক বেশী)। হুযূর (সা.) বললেন, পশমওয়ালা পশুর প্রত্যেক পশমের পরিবর্তেও একটি পুণ্য রয়েছে (আহমদ ও ইবনে মাজাহ্)।

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

ঈদুল আযহিয়ার সাথে মহানবী (সা.)-এর আর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এরও পারস্পরিক যোগসূত্র বিদ্যমান

আজ ঈদুল আযহিয়ার দিন আর এ ঈদ এমন এক মাসে আসে যাতে ইসলামী মাস শেষ হয়ে যায়, অর্থাৎ- পুনরায় মুহররম থেকে নববর্ষ আরম্ভ হয়। এটি বছর সময়কালের মাঝে এমন একটি মাস, যখন ঈদ পালিত হয়ে থাকে। এতে ইসলামী মাস বা যুগ শেষ হয় এবং এটা এদিকে ইঙ্গিত প্রদান করে যে, আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আগমনকারী মসীহ্‌র সাথে পারস্পরিক গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। ঐ পারস্পরিক সম্পর্ক কী? এক তো এই যে, আমাদের নবী করীম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষযুগের নবী ছিলেন আর তাঁর গোটা জীবন এবং সময় যেন যথাযথভাবে ঈদুল আযহিয়ার সময় ছিলো। যেহেতু এ বিষয়টি মুসলমান শিশুরাও অবহিত আছে যে, তিনি শেষযুগের নবী আর এ মাসও শেষমাস, তাই এ মাস তাঁর (সা.) ও যুগের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক রাখে।

দ্বিতীয় পারস্পরিক সম্পর্ক

দ্বিতীয় পারস্পরিক সম্পর্ক : যেহেতু এ মাসকে কুরবানীর মাস বলে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও প্রকৃতপক্ষে কুরবানীর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। যেভাবে আপনারা ছাগল, উট, গরু, দুম্বা যবাই করে থাকেন, সেভাবেই ঐ বিগত যুগে আজ থেকে ১৩০০বছর পূর্বে খোদা তা'লার পথে মানুষরা (সাহাবাগণ) উৎসর্গীকৃত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঈদুল আযহা তা-ই ছিলো আর সে-যুগেই মধ্য-গগনে সূর্যের আলো দীপ্তিমান ছিলো।

কুরবানীর তাৎপর্য

এসব কুরবানী এর শাঁস নয়, খোসা। আত্মা নয়, দেহ। সুযোগ-সুবিধা ও আরাম আয়েশের এ যুগে হাসি-খুশীর ঈদ পালিত হয়ে থাকে আর ঈদের পরিণতি হাসি-খুশী, নানা ধরনের খাবার দাবারের আয়োজন করায় পর্যবসিত হয়। মহিলারা এ দিনের সকল প্রকার অলংকার পরিধান করে। ভাল থেকে ভাল কাপড়ে সুসজ্জিত হয়। পুরুষেরা ভাল ভাল পোষাক পরিধান করে থাকে আর উত্তম খাদ্য পরিবেশন করা হয় এবং এটাকে এমন আনন্দ ও খুশীর দিন মনে করে যে, কৃপণ থেকে অধিকতর কৃপণ লোকও আজ মাংস খেয়ে থাকে। বিশেষ করে কাশ্মীরীদের পেট তো ছাগল বকরীর দ্বারা বোঝাই হয়ে যায়। অন্যান্য লোকরাও আসলে পিছনে পড়ে থাকে না। মোট কথা, প্রত্যেক ধরনের খেলা-ধূলা, হাসি তামাশার নাম ঈদ মনে করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, প্রকৃত তত্ত্বের প্রতি পরিপূর্ণ দৃষ্টি প্রদান করা হয় না।

গভীর রহস্য

প্রকৃতপক্ষে এ দিনের গভীর রহস্য এটা ছিলো যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) যে কুরবানীর বীজ বপন করেছিলেন এবং গোপনভাবে বপন করেছিলেন, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বায়ু-হিল্লোলিত সবুজ শ্যামল ক্ষেত দেখিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বীয় পুত্রকে খোদা তা'লার আদেশে যবাই করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি। এতে গুপ্তভাবে এই ইঙ্গিত ছিলো যে, মানুষ দেহ মনে খোদার হয়ে যায় আর খোদার আদেশের সম্মুখে সে তার প্রাণ, নিজের সন্তান-সন্ততি ও তার নিকটাত্মীয়-স্বজনের রক্তও তুচ্ছ মনে করে। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তিনি এমন এক পরিপূর্ণ পথ-নির্দেশনার দৃষ্টান্ত ছিলেন যে, কতই না বেশি কুরবানী দেয়া হয়েছে, রক্তে জঙ্গল প্লাবিত হয়ে গেছে, যেন রক্তের নদী প্রবাহিত হয়েছে। পিতাগণ নিজ পুত্রদের, পুত্রগণ নিজেদের পিতাদেরকে হত্যা করেছেন। এতে তাঁরা আনন্দ পেতেন যে, ইসলাম ও খোদার পথে টুকরো টুকরো হয়ে কিমা করা হলেও তাঁদের আনন্দ হতো। কিন্তু আজ চিন্তা করে দেখো যে, হাসি-খুশী ও খেলা-তামাশা ব্যতিরেকে আধ্যাত্মিকতার কোন অংশ অবশিষ্ট আছে কি? এ ঈদুল আযহা পূর্বের ঈদ থেকে শ্রেয় এবং সাধারণ লোকও এটাকে বড় ঈদ বলে থাকে। কিন্তু চিন্তা করে বলো যে, ঈদের কারণে কত লোক আছে যারা নিজেদের আত্মশুদ্ধি ও নির্মল চিত্ততার প্রতি কতটা দৃষ্টি প্রদান করে থাকে এবং আধ্যাত্মিকতা থেকে কত অংশ লাভ করে?

রমযানের ঈদ আসলে একটি সাধনার ফলশ্রুতি এবং ব্যক্তিগত সাধনা। আর এর নাম **বজলুর রূহ** অর্থাৎ আত্মাকে বিক্রি করা কিন্তু এ ঈদ,যাকে বড় ঈদ বলা হয়, এর মধ্যে মহান সাফল্য নিহিত আছে এবং দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়নি। খোদা তা'লা যাঁর দয়া গুণ কয়েকভাবে বিকশিত হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা উম্মতে মুহাম্মদীয়া (সা.)-এর ওপরে খুবই উন্নতমানের এক করুণা দেখিয়েছেন যা পূর্ববর্তী উম্মতের বিষয়াবলীতে ভাসাভাসা বা প্রাথমিক পর্যায়ের রঙে ছিল। এর মাহাত্ম্য এ উম্মতে মরহুমা বা করুণা লাভকারী উম্মতের মধ্যে তিনি (সা.)-ই দেখিয়েছেন, খোদা তা'লার এই যে ৪টি গুণ বর্ণিত হয়েছে যেমন, রাব্বুল আলামীন (সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক), রহমান (অযাচিত অসীম দাতা), রাহীম (পরম দয়াময়), মালিকি ইয়াওমিদ্দীন (চিবার দিবসের মালিক) যদিও সাধরণভাবে এসব গুণ এ বিশ্বের ওপর জ্যোতির্বিকাশ ঘটায় কিন্তু সূরা কাওসারের মধ্যে আসলে ওগুলোরই ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে। কিন্তু লোকেরা এর ওপর কমই দৃষ্টি দেয়।

(মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১-৩৩, ১৯৮৪ সনে মুদ্রিত)

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

৩য় খণ্ড

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

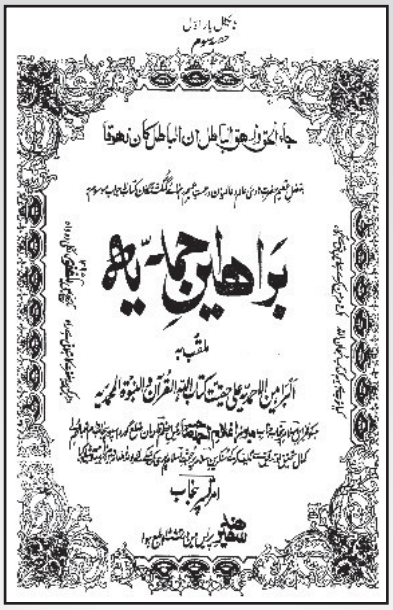

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(৩৩তম কিস্তি)

(টিকা ১১ চলমান)

অতএব এক্ষেত্রে আল্লাহ তা’লা প্রকাশ করেছেন যে, কুরআনের ওহীর প্রদীপ সেই কল্যাণময় বৃক্ষের তেল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে যা পূর্বেরও নয় আর পশ্চিমেরও নয় অর্থাৎ তা ভারসাম্যপূর্ণ মুহাম্মদী প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে না মুসায়ী প্রকৃতির কঠোরতা আছে না খ্রিস্টীয় স্বভাবের কোমলতা, বরং রয়েছে কঠোরতা ও কোমলতা এবং ক্রোধ ও অনুকম্পার এক অপূর্ব সমন্বয়। এছাড়া তা পরম ভারসাম্যের বহিঃপ্রকাশ এবং জালাল ও জামাল অর্থাৎ প্রতাপ ও সৌন্দর্যের সমাহার। অধিকন্তু তা মহানবী (সা.)-এর পরম ভারসাম্যপূর্ণ শ্রেষ্ঠ চারিত্রিক গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ, যা সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও মেধার সমভিব্যহারে ওহীর জ্যোতি প্রকাশের জন্য তেল আখ্যা পেয়েছে (অর্থাৎ ওহী নাযিল হওয়ার কারণ হয়েছে)।

এসব বিষয়ে আল্লাহ তা’লা মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে অন্যত্রও বলেছেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝

(সূরা আল্ কলম: ৫) অর্থাৎ হে নবী! তুমি মহান চারিত্রিক গুণাবলীর সমন্বয়ে সৃষ্ট ও গঠিত, অর্থাৎ স্বীয় সত্তায়, সকল সম্মানজনক চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলীতে এতটা সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ যে এর বেশি আর কিছু কল্পনাই করা যায় না; কেননা আরবী বাগধারায় আযীম শব্দ সেই বস্তুর বৈশিষ্ট্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় যা পূর্ণ শ্রেণীগত শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন বলা হয়, এ বৃক্ষটি আযীম বৃক্ষ, তখন এর অর্থ হবে একটা বৃক্ষের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যতটা সম্প্রসারিত হওয়া সম্ভব তার সবই এ বৃক্ষে রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, আযীম সেই বস্তুকে বলা হয় যার মাহাত্ম্য কল্পনা, ধারণা বা আয়ত্তের বাইরে।

খুল্‌ক বলতে কুরআন এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অন্যান্য গ্রন্থে শুধুমাত্র (সাধারণ মানুষের ধারণা অনুসারে) প্রসন্নতা, সুন্দর সংসর্গ, কোমলতা আর দয়া-মায়া ও ভদ্রতা বোঝায় না। ‘খে’-তে যবর ও পেশ যুক্ত অবস্থায় খাল্‌ক ও খুল্‌ক যথাক্রমে দু’টো পৃথক-পৃথক শব্দ, যার একটি অপরটির বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। ‘খাল্‌ক’ অর্থাৎ ‘খে’ এর ওপর যবর যুক্ত করে যখন লেখা হয় তখন মানুষের বাহ্যিক চেহারা বা অবয়ব বোঝায় যা আকৃতিদাতা খোদার পক্ষ থেকে মানুষকে দেয়া হয়েছে আর যার ফলে সে অন্যান্য প্রাণী থেকে ভিন্ন। আর পেশযুক্ত করে যখন লেখা হয় (অর্থাৎ খুল্‌ক) তখন মানুষের অভ্যন্তরীণ চেহারা অর্থাৎ অভ্যন্তরীন বৈশিষ্ট্যাবলী বোঝায় যার সুবাদে মানবের স্বরূপ পশুর রূপ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। অতএব মানুষের মাঝে মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে যত অভ্যন্তরীণ গুণাবলী দেখা যায় আর মানবতারূপী বৃক্ষ নিংড়ে যে নির্যাস বা বৈশিষ্ট্যাবলী বের করা সম্ভব, যা মানুষ ও পশুর মাঝে অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিকোণ থেকে পার্থক্য নিরূপণ করে– সে সবের নাম হলো খুল্‌ক। যেহেতু মানব প্রকৃতিরূপী বৃক্ষ সত্যিকার অর্থে মধ্যম পন্থা ও

ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর সকল পশুর পশুসুলভ শক্তি-বৃত্তিতে যে বাড়তি বা ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় তা থেকে সে মুক্ত; যে দিকে আল্লাহ্ তা'লা

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝

(সূরা আত্ ত্বীন: ৫)-এ ইঙ্গিত করছেন;তাই খুল্‌ক শব্দ যদি নিন্দাসূচক অর্থের বাইরে ব্যবহৃত হয় তাহলে এর অর্থ সর্বদা উন্নত নৈতিক গুণাবলী হয়ে থাকে।

আর সেই সকল শ্রেষ্ঠ নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলী বলতে মানুষের মাঝে বিদ্যমান আভ্যন্তরীণ সব বিশেষত্বকে বোঝায় যা মানবতার স্বরূপ বা নির্যাস , যেমন প্রখর-বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, আলোকিত চিন্তাধারা, উত্তম সংরক্ষণ, প্রখর স্মৃতিশক্তি, সতীত্ব বা পবিত্রতা, লজ্জাবোধ, ধৈর্য, স্বল্পে তুষ্টি, ধর্মানুরাগ, খোদাভীরুতা, বীরত্ব, অবিচলতা, সুবিচার, বিশ্বস্ততা, সত্য ভাষণ, যথাস্থানে উদারতা, যথাস্থানে ত্যাগ স্বীকার, যথাস্থানে বদান্যতা, যথাস্থানে উপকার বা কল্যাণ সাধন, যথাস্থানে মহানুভবতা, যথাস্থানে দৃঢ়তা, যথাস্থানে নম্রতা, যথাস্থানে সহিষ্ণুতা, যথাস্থানে আত্মসম্মানবোধ, যথাস্থানে বিনয়, যথাস্থানে শিষ্টাচার, যথাস্থানে স্নেহ, যথাস্থানে দয়ামায়া, যথাস্থানে কৃপা-করুণা, খোদা-প্রেম, খোদানুরাগ ও সবার প্রতি বিমুখ হয়ে খোদামুখী হওয়া ইত্যাদি।

আর সেই তেল এত পরিস্কার ও স্বচ্ছ যে, অগ্নিসংযোগ ছাড়াই যেন তা জ্বলে উঠবে। {অর্থাৎ সেই নিষ্পাপ নবী (সা.)-এর বিবেক-বুদ্ধি ও সকল মহান চারিত্রক গুণ ভারসাম্যতা, সূক্ষ্মতা ও জ্যোতির্ময়তার এমন পরম মার্গে উন্নীত ও উপনীত যে, ইলহাম লাভের পূর্বেই নিজ গুণে জ্বলে উঠতে উদ্যত ছিল}। نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ আলোর ওপর আলোর প্রবাহ। অর্থাৎ হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র ও মঙ্গলময় সত্তায় অনেক প্রকার আলোর সমাহার ঘটেছিল আর সেসব আলোর ওপরে আরও এক স্বর্গীয় আলো অবতীর্ণ হয়েছে যা ছিল আল্লাহ্‌র ওহী।

সেই আলো বর্ষিত হওয়ার ফলে খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর পবিত্র ও কল্যাণময় সত্তা আলোর মিলনমেলা বা মোহনায় পরিণত হয়েছে। সুতরাং এতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওহীর আলো অবতীর্ণ হওয়ার দর্শন হলো তা আলোর ওপরই অবতরণ করে, অমানিশার ওপর নয়। কেননা কল্যাণবারি অবতরণের জন্য সামঞ্জস্য হলো শর্ত। আলোর সাথে অমানিশার কোন সামঞ্জস্য নেই বরং আলোর সামঞ্জস্য হলো আলোর সাথে। প্রজ্ঞার মূর্ত-প্রতীক (আল্লাহ্) সামঞ্জস্য বা মিল ছাড়া কোন কাজ করেন না।

অনুরূপভাবে আলোরূপী কল্যাণপ্রবাহের ক্ষেত্রেও তাঁর নিয়ম এটিই যে, যার মাঝে কিছু আলো আছে তাকে আরো দেয়া হয়। যার কাছে কিছু নেই তাকে কিছুই দেয়া হয় না। যার কাছে চোখের আলো আছে সে-ই সূর্যের আলো পায় আর যার চোখে জ্যোতি নেই সে সূর্যের আলো হতেও বঞ্চিত থাকে। আর প্রকৃতিগত জ্যোতি যে কম পেয়েছে সে অপর জ্যোতিও স্বল্পই পায়। আর প্রকৃতিগত জ্যোতি যে বেশি পেয়েছে সে দ্বিতীয় জ্যোতিও অধিক প্রাপ্ত হয়। অতএব মানব প্রকৃতির পুরো পরিসীমায় নবীরা সেসব মহান ব্যক্তিত্ব যারা ব্যাপ্তি ও উৎকর্ষতার দিক থেকে এত বেশি অভ্যন্তরীণ জ্যোতি লাভ করেছেন যে, তাঁরা যেন জ্যোতির মূর্ত-প্রতীক হয়ে গেছেন।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে পবিত্র কুরআনে মহানবী (সা.)-এর নাম নূর ও সিরাজে মূনীর (প্রদীপ্ত সূর্য) রাখা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ

(সূরা আল্ মায়েদা:১৬)

وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۝

(সূরা আল্ আহযাব:৪৭) এ প্রজ্ঞার অধীনেই ওহীর জ্যোতি কেবল নবীরা লাভ করেছেন আর এটি তাঁদেরই বিশেষত্ব যা লাভের পূর্বশর্ত হলো সহজাত জ্যোতির সম্পূর্ণতা এবং সুমহান হওয়া।

সুতরাং এই নিখুঁত তথা অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে যা আল্লাহ্ তা'লা উপরোল্লিখিত উপমায় বর্ণনা করেছেন, তাদের কথার অসারতা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, যারা প্রকৃতিগত মর্যাদার পার্থক্যে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও নিছক নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার কারণে ধরে নিয়েছে যে, সেই জ্যোতি দুর্বল প্রকৃতির লোকদেরও লাভ হতে পারে যা উৎকর্ষ মানবের লাভ হয়।

সততা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে এদের ভেবে দেখা উচিত যে, ওহীর কল্যাণধারা সম্পর্কে এরা কত ভয়াবহ ভ্রান্তিতে নিপতিত হচ্ছে। তারা স্পষ্টভাবে দেখছে যে, প্রকৃতিতে বিরাজমান খোদার নিয়ম তাদের মিথ্যা ধারণার সত্যায়ন করে না, তা সত্ত্বেও বিদ্বেষ এবং শত্রুতার বশবর্তী হয়ে এই রুগ্ন ধ্যাণ-ধারণাকে আঁকড়ে ধরে বসে আছে।

অনুরূপভাবে, খ্রিস্টানরাও আলোর কল্যাণধারা লাভের জন্য প্রকৃতিগত আলোর শর্ত যে আবশ্যক, তা স্বীকার করে না আর বলে, যে হৃদয়ে ওহীর জ্যোতি অবতীর্ণ হয় তার জন্য অভ্যন্তরীণ কোন বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে জ্যোতির্মণ্ডিত হওয়া আবশ্যক নয়; বরং কোন ব্যক্তি যদি সুস্থ চিন্তাধারার অধিকারী না হয়ে চরম নির্বোধ ও বোকা হয়, বীরত্বের পরিবর্তে চরম ভীরু হয়, দানশীল না হয়ে চরম কৃপণ হয় আর আত্মমর্যাদাশীল হওয়ার পরিবর্তে আত্মসম্মানহীন হয়, খোদাপ্রেমের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে চরমভাবে দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন থাকে, তাক্বওয়া, সাধুতা, খোদাভীতি ও সততার বৈশিষ্ট্যে গুণান্বিত না হয়ে যদি জঘন্য চোর ও ডাকাত হয়, পবিত্রতা ও লজ্জাশীলতার পরিবর্তে যদি চরম নির্লজ্জ ও রিপু-পূজারী হয়, স্বল্পে-তুষ্টির পরিবর্তে যদি চরম লালসাগ্রস্ত হয়, অবস্থা এত শোচনীয় হওয়া সত্ত্বেও এমন ব্যক্তিও খোদার নবী এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হতে পারে! বরং হযরত ঈসা ছাড়া অন্য সব নবী, যাদের নবুয়তেও তারা বিশ্বাস করে আর যাদের ঐশী গ্রন্থাবলীকে পবিত্র বলতে বলতে তাদের মুখে ফেনা উঠে যায় নাউযুবিল্লাহ্ তাদের দৃষ্টিতে তাঁরা এমনই ছিলেন আর পবিত্র সব শ্রেষ্ঠত্ব হতে বঞ্চিত ছিলেন যা নিস্পাপ ও পবিত্র-হৃদয় হওয়ার আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ।

খ্রিস্টানদের বুদ্ধি ও তাদের খোদা সংক্রান্ত তত্ত্ব-জ্ঞানের জন্য সহস্র বাহবা! ওহীর জ্যোতি অবতরণের কতই না চমকপ্রদ দর্শন তারা উপস্থাপন করেছেন! কিন্তু

এমন দর্শনের অনুসারী এবং একে যারা ভালোবাসে তারা সেসব মানুষ যারা ঘোর অমানিশা ও অভ্যন্তরীণ অন্ধত্বের মাঝে নিপতিত। নতুবা আলো থেকে কল্যাণ লাভের জন্য যে আলো আবশ্যক, তা এমন একটি বাস্তব সত্য যা কোন দুর্বল বুদ্ধির মানুষও অস্বীকার করতে পারে না।

কিন্তু বিবেক-বুদ্ধির সাথে যাদের কোন সম্পর্ক নেই, যারা আলোর প্রতি বিদ্বেষ রাখে আর অন্ধকারকে ভালোবাসে, বাদুড়ের মত যাদের চোখ রাতে ভালোভাবে খোলে আর আলোকোজ্জ্বল দিনে তা অন্ধ হয়ে যায়, তাদের কিইবা চিকিৎসা করা যেতে পারে? খোদা যাকে পছন্দ করেন স্বীয় আলোর পানে (অর্থাৎ কুরআনের দিকে) পরিচালিত করেন আর মানুষের জন্য উপমাসমূহ বর্ণনা করেন, আর তিনি সব বিষয়ে সম্যক অবগত। (অর্থাৎ সঠিক পথের দিশা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে লব্ধ একটি বিষয় আর সে-ই তা লাভ করে, যার অনাদি ও অনন্ত দানের উৎস (অর্থাৎ খোদা) হতে সামর্থ লাভ হয়, অন্যদের নয়।

সূক্ষ্ম বিষয়াদি উপমার আদলে খোদা বর্ণনা করেন যেন গভীর রহস্যাবলী বোধগম্য হয়। কিন্তু তিনি স্বীয় আদি জ্ঞানের ভিত্তিতে খুব ভালোভাবে জানেন, কে সেসব উপমা বুঝবে এবং সত্য গ্রহণ করবে আর কে বঞ্চিত ও প্রত্যাখ্যাত হবে)। অতএব এ উপমায়, এখন পর্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় যার অনুবাদ করা হয়েছে, খোদা তা'লা পয়গম্বর (সা.)-এর হৃদয়কে স্বচ্ছ আয়নার সাথে তুলনা করেছেন যাতে কোন প্রকার পঙ্কিলতা নেই, এটি হৃদয়ের জ্যোতি। এছাড়া মহানবী (সা.)-এর বোধ-বুদ্ধি ও চেতনা, সুস্থ বিবেক এবং প্রকৃতিগত ও সহজাত সকল উন্নত নৈতিক চরিত্রকে এক অতি উন্নত মানের তেলের সাথে তুলনা করা হয়েছে যাতে রয়েছে প্রভূত ঔজ্জ্বল্য এবং যা প্রদীপের আলোর উৎস।এ হলো বিবেকের আলো, কেননা সব অভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের উৎসস্থল হলো যুক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি।

এসব আলোর ওপর একটি স্বর্গীয় আলো অর্থাৎ ওহী নাযিল হওয়ার কথা যে বলেছেন তাহলো ওহীর আলো। তিন প্রকার আলো সম্মিলিতভাবে মানুষের হিদায়াতের কারণ হয়েছে। এটিই ঐশী নীতি ও রীতি যা চির-পবিত্র সত্তার পক্ষ থেকে চিরন্তন রীতি আর তাঁর পবিত্র সত্তার জন্য এটিই মানানসই। অতএব এই পুরো গবেষণা থেকে প্রমাণিত হলো যে, যতক্ষণ কোন মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও হৃদয়ের আলো পরম পর্যায়ের না হবে, ততক্ষণ সে ওহীর আলো আদৌ প্রাপ্ত হয় না।

ইতোপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিবেক-বুদ্ধি ও হৃদয়ের জ্যোতির ক্ষেত্রে পরম উৎকর্ষতা কেবল সীমিতসংখ্যক মানুষের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সবার নয়। এখন এই উভয় প্রমাণকে একীভূত করার ফলে এ বিষয়টি চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হলো যে, ওহী ও রিসালাত কেবল কিছু অনুপম বৈশিষ্ট্যমন্ডিত মানুষই লাভ করে থাকে, সবাই নয়। সুতরাং সুনিশ্চিত এই প্রমাণের মাধ্যমে ব্রাহ্ম সমাজীদের এই ভ্রান্ত-ধারণা সম্পূর্ণভাবে অপনোদন করা হলো এবং আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এটিই।

৫ম সন্দেহ

কোন কোন ব্রাহ্ম সমাজী এ সন্দেহ ব্যক্ত করে থাকে যে, পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান কুরআনের ওপরই যদি নির্ভর করে, তাহলে খোদা সকল দেশে, সকল প্রাচীন ও আধুনিক জনবসতিতে কেন তা প্রচার করলেন না? কোটি কোটি মানুষকে কেন স্বীয় পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান ও সঠিক ধর্ম-বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত করলেন?

উত্তরঃ

কুমন্ত্রণাপূর্ণ এ ভ্রান্তিরও জন্ম হয়েছে অদূরদর্শীতার কারণে। কেননা, যেখানে অত্যন্ত পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হলো যে, পূর্ণ-বিশ্বাস ও পূর্ণ-তত্ত্বজ্ঞান আদৌ নিছক বুদ্ধির জোরে অর্জিত হতে পারে না, বরং সেই উন্নত-বিশ্বাস ও সম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান কেবল এমন এলহামের মাধ্যমে লাভ হয়, যা স্বীয় সত্তায় ও উৎকর্ষতায় হবে অনন্য ও অতুলনীয়। এটি যে খোদার পক্ষ থেকে, তা এর অনন্যতার কল্যাণে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক। অধিকন্তু আমরা এ গ্রন্থে এটিও প্রমাণ করেছি যে, কুরআনই পৃথিবীর একমাত্র অনন্য গ্রন্থ, অন্য কোনটি নয়।

এমন পরিস্থিতিতে সত্যান্বেষীর জন্য সহজ ও সঠিক পথ হবে, আমাদের যুক্তি খণ্ডন করে এটি প্রমাণ করা যে, পারলৌকিক বিষয়ে নিছক যুক্তি-বুদ্ধিই দৃঢ়-বিশ্বাস ও সঠিক এবং সুনিশ্চিত তত্ত্বজ্ঞানের মর্যাদায় উপনীত করতে সক্ষম। এটি প্রমাণ করতে না পারলে কুরআনের সত্যতা গ্রহণ করা উচিত, যার মাধ্যমে পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। এরপরও এটি গ্রহণ করা পছন্দ না হলে কুরআনের কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হোক। আর এর (কুরআনের) যে সকল অনন্য সৌন্দর্যাবলী রয়েছে তা অন্য কোন গ্রন্থ থেকেও বের করে দেখাক, যেন এটি প্রমাণ হতে পারে যে, বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানে পরমমার্গে উপনীত হওয়ার জন্য ঐশী গ্রন্থের যদিও একান্ত প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু ধরাপৃষ্ঠে এমন কোন গ্রন্থ বাস্তবে নেই।

কোন প্রতিদ্বন্দ্বী যদি এসকল কথার কোনটির উত্তর না দেয়, বরং তার মুখ খোলারই সাহস না হয়, তাহলে স্বয়ং তারই সুবিচার করা উচিত যে, যেখানে একটি সত্য বিষয় দৃঢ় প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত, যা খন্ডন করার কোন উপায় তার কাছে নেই, আর সে এর প্রমাণাদিও খন্ডন করার সামর্থ্য রাখেনা, তাহলে সুনিশ্চিত প্রমাণের বিপরীতে বিকৃত ধ্যাণ-ধারণা উপস্থাপন করা কতটা সততা ও বিশ্বাস-বিবর্জিত! গোটা বিশ্ব জানে, যে বিষয় সঠিক ও সত্য হওয়া অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত, যতদিন সে সকল প্রমাণ খণ্ডন করা না হবে, ততদিন পর্যন্ত সে বিষয়টি প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত একটি সত্যই বটে, যা নিছক হীন দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে ভ্রান্ত বলে গণ্য হতে পারে না। যে ঘরের ভিত, দেয়াল ও ছাদ অত্যন্ত দৃঢ়, তা কি কেবল মুখের ফুঁৎকারে উড়ে যেতে পারে? খোদা কেন স্বীয় গ্রন্থ সকল দেশে প্রচার করেন নি? আর বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ কেন এটি থেকে লাভবান হলো না?

(চলবে)

ভাষান্তর: মওলানা ফিরোজ আলম
মুরব্বী সিলসিলাহ্

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

এযালায়ে আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৪২তম কিস্তি)

অতি সরলতার দরুন কিছু উলামা এ আপত্তি উত্থাপন করেন যে, কুরআন করীমে 'ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা' আয়াতটির পরে যে 'রাফিউকা' (আলে ইমরান : ৫৬) এবং "বার্-রাফাআল্লাহু ইলাহি' (আন্ নিসা: ১৫৭) এসেছে, এতে করে তাঁর জীবিত হয়ে ওঠা প্রমাণিত হয়।' তারা বলেন, এ অর্থ যদি সঠিক না হয়ে থাকে তাহলে হযরত মসীহ্ ছাড়া অন্য কারও সপক্ষে 'রাফিউকা' শব্দ আসে নি কেন?'

কিন্তু আমি এ 'এযালায়ে আওহাম' পুস্তকেই এ যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়ের সবিস্তারে উত্তর লিখে এসেছি যে, 'রাফা' শব্দের অর্থ সসম্মানে উঠানো ও সদাত্মার উন্নীত হওয়াই বটে। যেমন, পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী প্রত্যেক মুমিনের আত্মাকে সসম্মানে খোদা তা'লার দিকে ওঠানো হয়ে থাকে। আর হযরত মসীহ্‌র 'রাফা' হওয়ার কথা যে এ জায়গায় সবিশেষ বর্ণিত হয়েছে এর কারণ হলো, হযরত মসীহ্‌কে সত্যের দাওয়াত বা প্রচার কাজে (পেলেস্টাইনে স্বল্পকালীন অবস্থানকালে) প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে হয়। আর ইহুদীরা মনে করেছিল, তিনি মিথ্যেবাদী। কেননা (তাদের মতে তৌরাত অনুযায়ী) সত্য মসীহ্‌র পূর্বে এলিয়া নবীর আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যকীয়। অতএব তারা অন্যান্য নবীর মতো হযরত মসীহ্‌র 'রাফা' তথা খোদা তা'লার দিকে সসম্মানে উত্থিত হওয়া সম্পর্কিত বিষয়টি অস্বীকার করলো। বরং তাঁকে তারা 'লা'নতী' বা অভিশপ্ত বলে নির্ধারণ করলো। বস্তুত 'লা'নতী' সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যার আত্মা 'রাফা' তথা সসম্মানে উত্থিত হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। অতএব এ কারণে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে (বিশেষভাবে) অভিপ্রেত ছিল যে, উক্ত অপবাদ থেকে হযরত মসীহ্‌কে মুক্ত ও পবিত্র সাব্যস্ত করা হোক। অতএব প্রথমে অযোগ্য ও হতভাগা ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা যে ভিত্তিতে হযরত মসীহ্‌কে নিজেদের অন্তরে অভিশপ্ত বলে নির্ধারণ করেছিল, সে ভিত্তিটিকে আল্লাহ্ তা'লা মিথ্যা সাব্যস্ত করেন। এরপর অতি স্পষ্টভাবে এ-ও বর্ণনা করেন যে, মসীহ্ অভিশপ্ত নন, এবং 'রাফা' (তথা সসম্মানে ঐশী সান্নিধ্যে) উন্নীত হওয়া থেকে বঞ্চিত নন। বরং স্বাভাবিক ও সম্মানজনক মৃত্যুতে তাঁর 'রাফা' সাধিত হয়।

হযরত মসীহ্ যেহেতু একজন নিরীহ-অসহায়ের মাতো দুনিয়ায় কয়েকদিন জীবন যাপন করেন এবং ইহুদীরা তাঁকে লাঞ্ছিত করতে অতি মাত্রায় সীমালঙ্ঘন করেছে। তাঁর (পবিত্র) মায়ের প্রতি জঘন্য মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে ও হযরত মসীহ্‌কে অভিশপ্ত সাব্যস্ত করেছে এবং সত্যপরায়ণদের মতো তাঁর 'রাফা' সাধিত হওয়াকে অস্বীকার করেছে। কেবল ইহুদীরাই তা করে নি, বরং খ্রিষ্টানরাও উল্লিখিত দ্বিতীয় ধারণাটির বশবর্তী হয়ে পড়ে এবং অতি হীন ও জঘন্য ভাবে একজন সত্যপরায়ণ ব্যক্তিকে অভিশপ্ত সাব্যস্ত করার মাধ্যমে নিজেদের নাজাত বা পরিত্রাণের শঠতাপূর্ণ এই পথ বের করেছে। আর একটুও খেয়াল করেনি যে হযরত মসীহ্‌র অভিশপ্ত হওয়ার ওপরই নাজাত বা পরিত্রাণ নির্ভরশীল এবং কেবল তখনই 'নাজাত' লাভ হয় যখন হযরত মসীহ্‌র মতো একজন সত্যপরায়ণ ও পবিত্র এবং সদাচারী ও খোদা তা'লার প্রিয় ব্যক্তিকে অভিশপ্ত সাব্যস্ত করা যায়! অতএব এরূপ মনগড়া পরিত্রাণের প্রতি চরম ধিক্কার! এর চেয়ে তো দোযখ হাজারো গুণে শ্রেয়।

মোটকথা, হযরত মসীহ্‌র ক্ষেত্রে ইহুদী ও

খ্রিষ্টান উভয় সম্প্রদায় যেহেতু আদব ও শিষ্ঠাচার হতে সুদূর পরাহত অভিধাসমূহের প্রয়োগকে বৈধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, সেহেতু খোদা তা'লার আত্মাভিমানবোধ এই পবিত্র ও সদাচারী ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদার সপক্ষে আবশ্যকীয় সাক্ষ্যপ্রদানে একটুও ছাড় দেয়নি। অতএব ইঞ্জিলে প্রদত্ত তাঁর পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মনিব ও অভিভাবক খাতামুল মুরসালীন (সা.)কে প্রেরণ করে কুরআন করীমে হযরত মসীহ্‌র সম্মান ও মর্যাদা ও 'রাফা'-এর সপক্ষে সাক্ষ্য দান করেন।

'রাফা' শব্দটি কুরআন করীমে কয়েক জায়গায় রয়েছে। এক জায়গায় 'বল্‌আম' সম্পর্কিত বৃত্তান্তেও উল্লেখ রয়েছে ঃ 'আমরা তার 'রাফা' চেয়েছিলাম, কিন্তু সে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে,' (সূরা আ'রাফ ঃ ১৭৭)। আর তেমনি আল্লাহ্ তা'লা একজন (প্রচার কাজে বাধার দরুন বাহ্যত) অক্ষম নবীর সম্পর্কে বলেন ঃ **'ওয়া রাফা'নাহু মাকানান আলাইয়া'** [(সূরা মরিয়ম ঃ ৫৮) অর্থ 'আর আমরা তাকে এক উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করি' –অনুবাদক]। প্রকৃতপক্ষে তিনিও এমন একজন নবী ছিলেন, যার 'রাফা' বিষয়ে মানুষ অস্বীকার করেছিল। আর যেহেতু হযরত মসীহ্‌র মতো এ অধমেরও (উলামা কর্তৃক) অপমান করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হয়নি। কেউ 'কাফির' আখ্যা দেয় আর কেউ 'মুলহিদ' এবং কেউ 'বেঈমান' বলে অভিহিত করে এবং মুফ্‌তি ও মৌলবিগণ ক্রুশে বিদ্ধ করতেও প্রস্তুত! যেমন, মিঞা আব্দুল হক্ব (অমৃতসরী) তার প্রচারপত্রে লেখেন, 'এ ব্যক্তির ক্ষেত্রে মুসলমানদের হাত দ্বারাও কিছু কাজ সমাধা করা উচিত।' কিন্তু রোমান শাসক পিলাইটের চেয়েও অধিক এ বৃটিশ সরকার নিরপরাধ ও নির্দোষদের নিগ্রানী ও দেখভালের দিকে দৃষ্টি দেয় এবং পিলাইটের মতো প্রজাদের দাপট ও ভীতি প্রদর্শনে নত ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় ভীত হয় না। কিন্তু লাঞ্ছিত করার ক্ষেত্রে আমাদের এই জাতি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি, যাতেকরে উভয় দিকে সাদৃশ্য সাব্যস্ত করে দেখিয়ে দেয়। তাদের প্রতি নাকি এ মর্মে ইল্‌হাম (ঐশীবাণী)-ও অবতীর্ণ হয়েছে, 'এ ব্যক্তি (অর্থাৎ এ অধম) জাহান্নামী, অবশেষে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে এবং সে ঐসব লোকের আন্তর্ভুক্ত হবে না, যাদেরকে সসম্মানে খোদা তা'লার দিকে 'রাফা' দান করা হয়।' অতএব আজ আমি সেই ইল্‌হামের অর্থ উপলব্ধি করেছি, যা ইতোপূর্বে বেশ কয়েক বছর আগে বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর তা হলো :

"ইয়া ঈসা ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা ওয়া রাফেউকা ইলাইয়া ওয়া জায়িলুল্লা যীনাত্‌তাবাউকা ফাওকাল্লাযিনা কাফারু ইলা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ। এই মৌলবী সাহেবান– আব্দুর রহমান ও আব্দুল হক্ তো আমাকে এখন নিশ্চিত নরকবাসী বানাচ্ছেন বা সাব্যস্ত করেন, কিন্তু তাদের বয়ানের দশ বছর পূর্বে খোদা তা'লা আমাকে জান্নাতি হওয়ার প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। আর ইহুদীরা যেমন ও যেভাবে ধারণা করেছিল যে, ঈসা-মসীহ্ (নাউযুবিল্লাহ্) অভিশপ্ত এবং কখনও সসম্মানে তার 'রাফা' হবে না এবং তাদের খন্ডনে (কুরআন করীমে) এ আয়াত নাযেল হয়েছিল ঃ **'ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফীকা ও রাফিউকা ইলাইয়া'**, অনুরূপভাবে, খোদা তা'লা এ জায়গায়ও পূর্বোহ্নেই তাঁর আদি ও অনাদি জ্ঞানের কারণে উল্লিখিত ইলহামটি ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ এ অধমের হৃদয়-পটে 'ইলক্বা' করে দিলেন। যেহেতু তিনি জানতেন, কয়েক বছর পর মৌলবী আব্দুর রহমান ও মৌলবী আব্দুল হক্ সেভাবেই এ অধমকে অভিশপ্ত আখ্যা দেবে, যেভাবে ইহুদীরা হযরত মসীহ্ (আ.)-কে আখ্যা দিয়েছিল। এ কারণে ঘটনা ঘটার পূর্বেই তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণীটি 'বারাহীন' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়ে যেন সারা জাহান ও সারা বিশ্বে এর প্রচার ছড়িয়ে দিয়েছেন যাতেকরে তাঁর কুদরত ও হিকমত (প্রজ্ঞা) প্রকাশিত হয়। আর যাতে এ-ও জানা হোক যে হযরত মসীহ্‌র যুগে (ইহুদী) মৌলবীরা যেমন তাঁকে অভিশপ্ত মনে করে ও তাঁর বেহেশতী হওয়াকে অস্বীকার করে এবং খোদা তা'লার দিকে তাঁর সসম্মানে 'রাফা' (উন্নীত) হওয়া ও সত্যবাদীদের দলভুক্ত হয়ে তাঁদের সাথে মিলিত হওয়া মেনে নেয় নি, অনুরূপভাবে এ অধমের স্বধর্মীয় মৌলবীগণ এ অধমকে খোদা তা'লার রহমত হতে বঞ্চিত করতে চেয়েছে। বস্তুত কঠিন গোনাহগার মু'মিনরাও কিছু পরিমাণ সম্মানের অধিকারী হয়ে থাকে। কিন্তু এ মৌলবীরা কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে সর্বসাধারণ্যে বক্তৃতা প্রদান করেন, চিঠি লিখেন এবং বিজ্ঞাপন ছেপে প্রচার করেন। অতএব উল্লিখিত সাদৃশ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে খোদা তা'লা তাদের মাধ্যমে একাজটি গ্রহণ করেন। তবে দোযখী ও বেহেশতী প্রকৃতপক্ষে কে বা কারা এর স্বরূপ সম্পর্কে মৃত্যুর পর সবাই জ্ঞাত হবে। তখন কতক লোক অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে দোযাখে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় বলবে ঃ **'মা লানা লা নারা রিজালান কুন্না নাউদ্দুহুম মিনাল্ আশ্‌রার'** [অর্থঃ 'আমাদের কি হয়েছে, আমরা যে ঐসব লোকদেরকে দেখছি না, যাদেরকে আমরা অতি মন্দ বলে গণ্য করতাম?' (সূরা সাদ ঃ ৬৩) –অনুবাদক]।

عیب رنداں مکن اے زاہد پاکیزہ سرشت
تو چہ دانی کہ پس پردہ چہ خوب ست و چہ زشت

(অর্থ : হে পবিত্রচেতা সত্যান্বেষী! ছিদ্রান্বেষণ করো না।

পর্দার আড়ালে কে ভাল কে মন্দ তার তুমি কী জান?)

এখন মোদ্দাকথা হলো, যে-'রাফা' শব্দটি হযরত মসীহ্‌র জন্য কুরআন করীমে এসেছে, সে শব্দটিই খোদা তা'লা ইল্‌হাম বা ঐশীবাণীতে এ অধমের জন্যেও বলেছেন।

(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

জুমুআর খুতবা

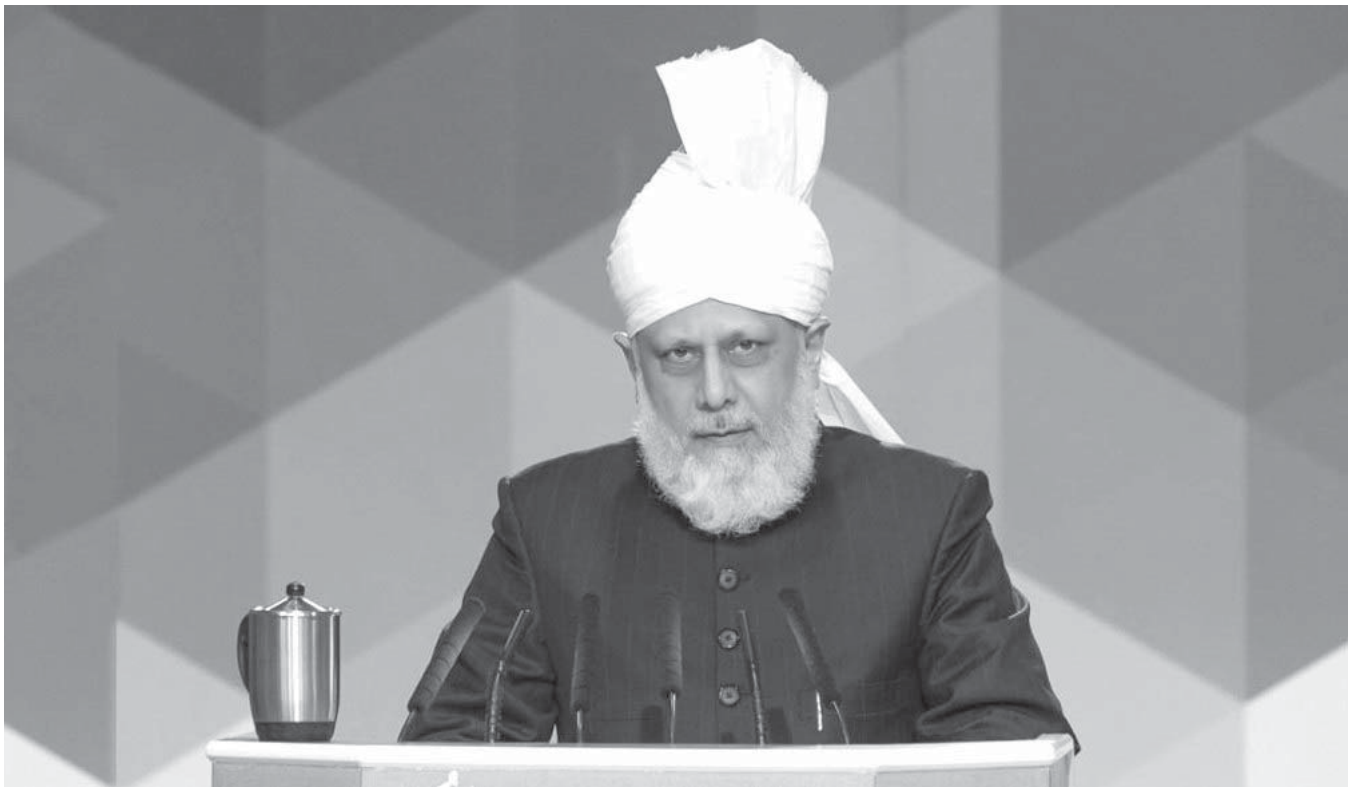

নামাযের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ২০ জানুয়ারি, ২০১৭ মোতাবেক ২০ সুলাহ্ ১৩৯৬ হিজরী

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমাদের মাঝে এমন কেউ আছে কি, যে এ কথা জানে না যে, মুসলমানদের জন্য নামায ফরয বা অবশ্য পালনীয় ইবাদত। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন প্রাসঙ্গিকতায় নামাযের গুরুত্ব তুলে ধরে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মহানবী (সা.)ও বলেছেন, নামায ইবাদতের সার বা নির্যাস। (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাওয়াত, হাদীস ৩৩৭১)

তিনি (সা.) সেই সাথে আরও বলেছেন, নামায পরিত্যাগ করা মানুষকে কুফরী এবং শিরকের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। (সহীহ্ মুসলিম কিতাবুল ঈমান, হাদীস ১৪৯)

নামাযের গুরুত্ব বর্ণনা করতে তিনি (সা.) পুনরায় বলেছেন, কিয়ামত দিবসে সর্ব প্রথম যে আমলের বিষয়ে বান্দাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বা যে বিষয়ের হিসাবনিকাশ নেয়া হবে, তা হল নামায। এ হিসাব সঠিক হলে সে সফলকাম হল আর পরিত্রাণ পেয়ে গেল, অন্যথায় সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হল। (সুনানে তিরমিযী, আবওয়াবুস সালাত, হাদীস ৪১৩)

এরপর মহানবী (সা.) শিশুদেরকেও নামাযে অভ্যস্ত করার কথা বলেছেন। তিনি (সা.) বলেন, ৭ বছর বয়সে উপনীত হতেই শিশুদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও আর ১০ বছর বয়সে যথারীতি তাকে নামাযে অভ্যস্ত করাতে কিছুটা কঠোর হতে হলেও তা হও।

মু'মিনের সবচেয়ে বড় হুমকি, যা থেকে নিরাপদ থাকার জন্য ঘাটি স্থাপনের প্রয়োজন আর সেই আশঙ্কা হল শয়তানের হামলা। জাগতিক কামনা-বাসনার লালসা, যা শয়তান হৃদয়ে সৃষ্টি করে, এরই মাধ্যমে শয়তান হামলা চালায়। অতএব, এসব থেকে নিরাপদ থাকার জন্য বাজামা'ত নামায পড়াই হল সেই ছাউনি আর এটিই নিরাপত্তারক্ষীদের সেই ব্যাটেলিয়ান, যা শয়তানের হামলা থেকে নিরাপদ রাখবে, পাপ থেকে মানুষ নিরাপদ থাকবে আর পুণ্যের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হবে।

(সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুস সালাত, হাদীস ৪৯৫)

পিতামাতাই যদি যথারীতি নামাযে অভ্যস্ত না হয়, তবে শিশুদের কীভাবে বলতে পারে? অথবা কোন মাধ্যমে শিশুরা যদি এ হাদীস বা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উক্তি শুনতে পায় আর ঘরে নামাযের উপর পিতাদেরকেই যদি প্রতিষ্ঠিত না পায়, তাহলে তাদের উপর কী প্রভাব পড়বে? এমন পিতাদের সন্তানরা অবশ্যই এটি মনে করবে যে, এই নির্দেশের কোন গুরুত্বই নেই। বরং একটি নির্দেশের গুরুত্বকে উপেক্ষা করার ফলশ্রুতিতে শিশুর মন-মস্তিষ্ক থেকে ইসলামী প্রতিটি নির্দেশের গুরুত্ব হারিয়ে যাবে। মহানবী (সা.)-এর উক্তি অনুসারে, এমন মানুষ কেবল নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না, বরং নিজেদের সন্তান-সন্ততিকেও ক্ষতিগ্রস্ত-শ্রেণির মাঝে ঠেলে দিচ্ছে। জাগতিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে পিতামাতারা শিশুদের জাগতিক উন্নতির জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু যে বিষয়ে প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হওয়া উচিত, তা নিয়ে তাদের মোটেই মাথা-ব্যথা নেই।

একজন মু'মিনের জন্য শুধু নামাযই কেবল আবশ্যক নয়, যার মাধ্যমে তার আধ্যাত্মিক ময়লা-আবর্জনা দূরীভূত হয়, যেভাবে একটি উপমা বর্ণনা করে মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমরা কি ভাবতে পার যে, কারো বাড়ির সামনে দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হয় আর তাতে সে দৈনিক পাঁচ বেলা গোসল করা সত্ত্বেও তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থেকে যেতে পারে? সাহাবীরা (রা.) নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! অবশ্যই কোন ময়লা থাকতে পারে না। মহানবী (সা.) তখন বললেন, পাঁচ বেলা নামাযের দৃষ্টান্তও এমনই। আল্লাহ্ তা'লা নামাযের কল্যাণে পাপ ক্ষমা করে দেন আর দুর্বলতা বিদূরীত করেন। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবু মাওয়াকিতুস সালাত, হাদীস ৫২৮) পাঁচ বেলার নামায আদায়কারীর আত্মায় কোন ময়লা জমতে পারে না।

অতএব, এই হল নামাযের গুরুত্ব, যা মহানবী (সা.) এক অনুপম দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, নামায শুধু পড়ার আদেশই নয়, বরং সত্যিকার মু'মিন পুরুষদের আত্মার কলুষ দূরীভূত করার জন্য বিষয়টি তিনি (সা.) আরো খোলাসা করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি ঘর থেকে ওজু করে খোদার ঘরে অর্থাৎ, মসজিদের দিকে ফরয নামায আদায়ের জন্য অগ্রসর হয়, যাওয়ার পথে যতটা পদক্ষেপ সে উঠাবে, তার মধ্যকার একটি পদক্ষেপে একটি পাপ দূরীভূত হলে দ্বিতীয় পদক্ষেপে তার পদমর্যাদা একগুণ উন্নীত হবে। অর্থাৎ, প্রতিটি পদক্ষেপ তার জন্য পুণ্য বয়ে আনবে। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদে ওয়া মাওয়াযিয়িস্ সালাতে, হাদীস ১৪০৬)

একবার তিনি (সা.) বাজামা'ত নামাযের গুরুত্ব পুনরায় এভাবে তুলে ধরেন যে, আমি কি সেকথা তোমাদেরকে অবহিত করব না, যার কল্যাণে খোদা পাপ মোচন করেন এবং পদমর্যাদা উন্নীত করেন? সাহাবা (রা.), যারা পুণ্যকর্মের সুযোগের সন্ধানে প্রতিটি মুহূর্তে এভাবে সজাগ থাকতেন যে, আমাদের কখন কোন সুযোগ সৃষ্টি হয় আর আমরা খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি, [তারা (রা.) তাঁকে সন্তুষ্ট করার রীতি শিখতে তাঁর নৈকট্য অর্জনে সচেতন থাকতেন এবং পাপের সাথে দূরত্ব সৃষ্টির বিষয়ে সদা-সচেতন থাকতেন।] তারা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! অবশ্যই আমাদেরকে বলুন। তিনি (সা.) বলেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও খুব ভালোভাবে ওজু করা আর দূর থেকে হেঁটে মসজিদে আসা আর এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য প্রতিক্ষায় থাকা। এ সবকিছু মানুষের সাথে পাপের ব্যবধান বাড়ায়। তিনি (সা.) বলেন, কেবল তা-ই নয়, এটি এক ধরণের 'রিবাত'। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুত্ তাহরাত, হাদীস ৪৭৫) অর্থাৎ, এটি সীমান্তে সেনাঘাটি স্থাপনের শামিল। কোন দেশ যেভাবে নিজের নিরাপত্তার জন্য সীমান্তে ক্যানটনমেন্ট বা সেনা-ছাউনি গড়ে তুলে এবং সেনা প্রহরা বসায়, এটিও তেমনই একটি বিষয়।

সীমান্তে ঘাঁটি কেন স্থাপন করা হয়? এ জন্যই যে, যেভাবে আমি বলেছি, দেশের নিরাপত্তার জন্য, শত্রুর আক্রমণের মুখে যেন নিরাপদ থাকা যায় আর তাৎক্ষণিভাবে আক্রমণের মুহূর্তে তা প্রতিহত করতে প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব হয়।

সুতরাং মু'মিনের সবচেয়ে বড় হুমকি, যা থেকে নিরাপদ থাকার জন্য ঘাটি স্থাপনের প্রয়োজন আর সেই আশঙ্কা হল শয়তানের হামলা। জাগতিক কামনা-বাসনার

আমি প্রায়শঃ আমার খুতবায় এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি, কোন না কোন বরাতে নামাযের প্রতি সব সময় মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু এর পুণরাবৃত্তি করা এবং এ দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা মুরব্বীয়ান এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। জামা'তের প্রতিটি সদস্যের কাছে নামাযের গুরুত্বের কথা বারবার পৌঁছান, প্রতিনিয়ত স্মরণ করান। সত্যিকার অর্থে আহমদী হিসেবে নিজের দায়িত্ব আমরা তখন পালন করতে সক্ষম হব, যখন নামাযের হিফাযত করব আর এগুলো থেকে আধ্যাত্মিক স্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করব। এই আধ্যাত্মিক স্বাদ এবং আনন্দ লাভ হওয়া আরম্ভ হলেই নামায আদায়ের প্রতি নিজ থেকেই মনোযোগ নিবদ্ধ হবে।

লালসা, যা শয়তান হৃদয়ে সৃষ্টি করে, এরই মাধ্যমে শয়তান হামলা চালায়। অতএব, এসব থেকে নিরাপদ থাকার জন্য বাজামা'ত নামায পড়াই হল সেই ছাউনি আর এটিই নিরাপত্তারক্ষীদের সেই ব্যাটেলিয়ান, যা শয়তানের হামলা থেকে নিরাপদ রাখবে, পাপ থেকে মানুষ নিরাপদ থাকবে আর পুণ্যের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হবে।

অনুরূপভাবে, বাজামা'ত নামাযের প্রতিদান একা নামায পড়ার তুলনায় ২৭গুণ বেশি। রসূল করীম (সা.)-এর এ সংক্রান্ত উক্তিও রয়েছে। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আযান, হাদীস ৬৪৫)

বাজামা'ত নামাযের গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

"নামাযের মধ্যে জামা'তবদ্ধ নামাযে বেশি সওয়াব রাখা হয়েছে" (অর্থাৎ জামা'তের সাথে নামায পড়ার অধিক সওয়াব নির্ধারণ করেছেন।) এর কারণ হল, এর ফলে ঐক্য সৃষ্টি হয় আর ঐক্যকে ব্যবহারিক রূপ দেয়ার উপর এতটা জোর এবং তাকিদ করা হয়েছে যে, পরস্পর পা-ও যেন সমান রাখা হয় (অর্থাৎ, সারিবদ্ধভাবে যখন দাঁড়াও, তখন পা যেন সমান থাকে। এ জন্য পরস্পরের পায়ের গোড়ালী এক সরল রেখায় রাখা হয়) আর কাতার বা সারি যেন সোজা হয় আর কাঁধে কাঁধ-মিলিয়ে দাঁড়াতে হয়। এর উদ্দেশ্য হল, মানব জাতি যেন এক মানব সত্তায় পরিণত হয়। (সারিবদ্ধ হলে একজন মানুষের মত হয়ে যাবে। অর্থাৎ, এতে শক্তি সঞ্চার হবে।) একজনের জ্যোতি দ্বিতীয় ব্যক্তির মাঝে সঞ্চারিত হবে।" তিনি বলেন, "সেই বৈষম্য, যার ফলে অহমিকা ও স্বার্থপরতা দানা বাঁধতে পারে, তা আর থাকবে না।" (অর্থাৎ ধনী-গরিব সবাই একই সারিতে দণ্ডায়মান হয়, অনেকের মাথায় কিছু কথা জমা থাকে, অহংকার থাকে বা আত্মশ্লাঘা থাকে, বাজামা'ত নামায তা দূরীভূত করে।) তিনি (আ.) বলেন, "ভালোভাবে স্মরণ রেখো! মানুষের মাঝে পরস্পরের জ্যোতি বা আলো গ্রহণের শক্তি আছে।" (মলফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৪৭-২৪৮, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত) (অর্থাৎ, পুণ্যের ক্ষেত্রে যে উন্নত মার্গে রয়েছে, তার পুণ্যকর্ম অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করায় দ্বিতীয় ব্যক্তি তা গ্রহণ করবে।)

অতএব, পুণ্যের প্রভাব গ্রহণ ও বিস্তারের জন্য বাজামা'ত নামায কল্যাণকর হয়ে থাকে। বাজামা'ত নামাযের মাধ্যমে যেভাবে একতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে যে, খোদা তা'লা উম্মতের মাঝে যা সৃষ্টি করতে চান, একইভাবে পরস্পরের নেকী ও পুণ্য একে অপরকে প্রভাবিত করে। অনুরূপভাবে, অধিক সৎকর্মশীল এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অগ্রগামী ব্যক্তির সাথে দুর্বল মানুষও একই সারিতে যদি দণ্ডায়মান হয়, তবে দুর্বলদের উপর পুণ্যবানদের পুণ্যের ইতিবাচক প্রভাব পড়বে, তাদের মাঝেও পুণ্যের ক্ষেত্রে উন্নতি, অগ্রগতি এবং আধ্যাত্মিকতায় অগ্রগামী হওয়ার শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আর যখন এই ঐক্য সৃষ্টি হয় এবং আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি সাধিত হয়, তখন শয়তানী অপশক্তি দুর্বল হয়ে যায়।

এ যুগে, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার ও নিবেদিত-প্রাণ দাসকে প্রেরণ করেছেন, যিনি আমাদেরকে ইবাদত এবং নামাযের সঠিক তত্ত্বজ্ঞান লাভের এবং ব্যুৎপত্তি অর্জনের পথ দেখিয়েছেন। অতএব, একদিকে যদি আমরা এ দাবি করি যে, আমরা আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির জন্য এবং নামায প্রতিষ্ঠার জন্য রসূলে করীম (সা.)-এর নিবেদিত-প্রাণ দাস প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ ও মাহ্দী (আ.)কে গ্রহণ করেছি, আর অপরদিকে আমাদের ব্যবহারিক আচরণ, বিশেষ করে ইসলামী মৌলিক নির্দেশ প্রতিপালনের ক্ষেত্রে যদি দুর্বলতা থাকে, যা অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব আর যা প্রতিষ্ঠা করা হল আমাদেরকে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ন্যূনতম মানও আল্লাহ্ তা'লা নির্ধারন করে দিয়েছেন, সেই ক্ষেত্রেই যদি দুর্বলতা থাকে, তাহলে কীভাবে আমরা এ দাবি করতে পারি যে, আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং খোদার নির্দেশাবলী মেনে চলার উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)কে গ্রহণ করেছি!

যেভাবে আমি বলেছি, কুরআনেরও বহু জায়গায় পাঁচ বেলার নামাযের অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে রসূল করীম (সা.)-এর উক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট, যা আমি তুলে ধরেছি। নামায নিঃসন্দেহে সব আহমদীর জন্য আবশ্যক। কিন্তু একই সাথে বাজামা'ত নামাযের যে গুরুত্ব মহানবী (সা.) বর্ণনা করেছেন, প্রত্যেক (বোধ সম্পন্ন) সাবালক ব্যক্তির জন্য তা ফরয বা আবশ্যিক রূপে পালনীয়। কিন্তু আমরা যা দেখি তা হল, এদিকে পুরো মনোযোগ নেই বা এ ক্ষেত্রে দুর্বলতা রয়েছে। নিঃসন্দেহে একজন সত্যিকার মু'মিনের জন্য নামায ফরয আর এ বিষয়ে তাকে সচেতন হতেই হবে। কিন্তু জামা'তেও একটি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে আর এ ব্যবস্থাপনাকেও এ দিকে দৃষ্টি আর্কষণ করতে থাকা উচিত আর সব সময় এর প্রকৃত গুরুত্ব স্পষ্ট করা উচিত। আমি প্রায়শঃ আমার খুতবায় এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি, কোন না কোন বরাতে নামাযের প্রতি সব সময় মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু এর পুণরাবৃত্তি করা এবং এ দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা মুরব্বীয়ান এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। জামা'তের প্রতিটি সদস্যের কাছে নামাযের গুরুত্বের কথা বারবার পৌঁছান, প্রতিনিয়ত স্মরণ করান জরুরী। সত্যিকার অর্থে আহমদী হিসেবে নিজের দায়িত্ব আমরা তখন পালন করতে সক্ষম হব, যখন নামাযের হিফাযত করব আর এগুলো থেকে আধ্যাত্মিক স্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করব। আধ্যাত্মিক এই স্বাদ এবং আনন্দ লাভ হওয়া আরম্ভ হলেই নামায আদায়ের প্রতি নিজ থেকেই মনোযোগ নিবদ্ধ হবে।

অতএব, আমি যেভাবে বলেছি, এদিকে সব আহমদীর নিজেরই মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। দেখতে হবে যে, কিভাবে আমাদের নামায পড়া উচিত। এমন নামায পড়া উচিত, যা আমাদের আত্মিক প্রশান্তির কারণ হতে পারে এবং যা উপভোগ্য হয়ে উঠে।

নামাযের স্বাদ কিভাবে পাওয়া সম্ভব হতে পারে, এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, "আমি দেখি, এক মদখোর, নেশাসক্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ নেশা না হয়, উপর্যুপরি পান করতে থাকে।" (নেশাগ্রস্ত হওয়ার মানসে উপর্যুপরি মদ পান করতে থাকে।) এক পর্যায়ে গিয়ে তার নেশা হয়, নেশায় এক প্রকার বুঁদ হয়ে থাকে। বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি এটি থেকে লাভবান হতে পারে।" (অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি বুদ্ধিমান হয়, তাহলে সে এই উদাহরণ থেকে শিখতে পারে আর তা কিভাবে? আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির জন্য, নামাযের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রীতিমত তার নামায পড়া উচিত, যথাসময়ে নামায পড়া উচিত আর কখনই নামায পরিত্যাগ করা উচিত নয়।) তিনি (আ.) বলেন, "আর স্বাদ না পাওয়া পর্যন্ত পড়তে থাকা উচিত। মদখোর ব্যক্তির মাথায় এক অলীক স্বাদ যেভাবে লুক্কায়িত থাকে, যা অর্জন করা তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে"।

তিনি (আ.) বলেছেন, মদখোর যেভাবে তার নেশার জন্য একটি টার্গেট বা লক্ষ্য নির্ধারণ করে, একইভাবে এক অধ্যাত্মিক ব্যক্তি, এক মু'মিনকেও তার কোন লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত, যা তাকে নামাযের জন্য অর্জন করতে হবে। অনুরূপভাবে, বারংবার এবং স্থায়ীরূপে যদি সে চেষ্টা করতে থাকে, কেবল তবেই সে সেই স্বাদ পেতে পারে। তিনি (আ.) বলেন, "তেমনিভাবে তার মন-মস্তিষ্ক এবং তার সমস্ত শক্তি-বৃত্তি যেন নামাযে এই স্বাদ পাওয়ার জন্য নিবেদিত হয়।" এক নামাযী যখন নামায পড়ে, তখন যেন সে তার মাথায় এ বিষয়টি রাখে এবং তার পুরো মনোযোগ ও শক্তি-সামর্থ্যকে যেন নামায পড়ার সময় এই লক্ষ্যে নিয়োজিত করে যে, আমাকে এই স্বাদ পেতেই হবে। আর এ জন্য তাকে ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। প্রবল ইচ্ছা থাকলেই সে অবিচল হতে পারবে। তিনি (আ.) বলেন, "এই লক্ষ্য অর্জনে এক নিষ্ঠা ও উদ্দীপনার সাথে অন্ততঃপক্ষে এই নেশাখোর ব্যক্তির উৎকণ্ঠা এবং ব্যাকুলতা সদৃশ এক দোয়াও যদি উদ্ভূত হয়ে সেই স্বাদ পায়, তাহলে আমি বলছি আর সত্য সত্যই বলছি যে,... সেই কাঙ্ক্ষিত স্বাদ অবশ্য অবশ্যই লাভ হবে।" এর জন্য যদি এক বেদনা, উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা থাকে যে, হায়! আমি যদি নামাযে স্বাদ পেতাম। নামায পড়তে গিয়ে যদি খোদার দরবারে বারবার এই ব্যাকুলতা প্রকাশ করা হয়, তবে তিনি (আ.) বলেন, নিশ্চিতভাবে সেই স্বাদ লাভ হবে এবং নামায উপভোগ্য হয়ে উঠবে। (মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৭-৮, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

অতএব, নামাযের স্বাদ পাওয়ার জন্য স্থায়ী চেষ্টা করতে থাকলে অবশেষে হৃদয় বিগলিত করে তাকে সেই স্বাদ বা আনন্দ উপহার দেয়। এই বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে তিনি (আ.) এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নামায অশ্লীলতা এবং পাপ থেকে রক্ষা করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দেখি, মানুষ প্রশ্নও করে যে, নামায পড়া সত্ত্বেও মানুষ মন্দকাজ করছে, পাপে লিপ্ত হচ্ছে। তিনি (আ.) বলেন, এর উত্তর হল, আন্তরিক প্রেরণা এবং সঠিক নিষ্ঠার সাথে তারা নামায পড়ে না, বরং প্রথাগতভাবে ও অভ্যাসবশত কপাল মাটিতে ঠেকায়। (মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৯, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

অতএব, সবসময় আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, নামায পাপ থেকে মুক্ত রাখে, এটি চিরায়ত সত্য। আল্লাহ্ তা'লার কথা মিথ্যা হতে পারে না। যাদের মাঝে নামায পড়া সত্ত্বেও পাপ থেকে যায়, তাদের নামায কেবল বাহ্যিক নামায হয়ে থাকে। তারা নামাযের প্রকৃত প্রাণ কি, তা বুঝে না। অতএব এটি সত্যিই চিন্তার বিষয়, এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকের নিজের অবস্থা এবং অবস্থান খতিয়ে দেখতে হবে। আমরা যদি আনন্দ পাই, বা উপভোগ করি আর যদি এই দৃঢ় সংকল্প থাকে যে, আমাকে নামায উপভোগ করতে হবে, নামাযের স্বাদ পেতে হবে, তাহলে এটি কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নামায নিয়মিত পড়বে না। এই স্বাদ এবং এই আনন্দের অভিজ্ঞতা কোন না কোন সময় সবারই

হয়ে যায় বা হয়ে থাকবে। আমরা দেখতে পাই, মানুষ যখন সমস্যা-কবলিত হয়, তখন অনেকেই নামাযে ক্রন্দন করে, আকুতি-মিনতির সাথে নামায পড়ে, চলাফেরার সময়ও আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে, আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে আর এই কারণে ইবাদতের প্রতিও সে মনোযোগী হয়। তাদের হৃদয়ে কোন না কোন চিন্তার উদ্রেক হয় এবং কিছু না কিছু মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। যার জন্য সে কষ্টের মুহূর্তে স্থায়ীভাবে দোয়ায় রত থাকে। কিন্তু নিজের বাসনা যখন চরিতার্থ হয়ে যায় আর সমস্যা থেকে উত্তরণ ঘটে, তখন অনেকেই এমন আছে, যাদের নামায এবং বিনয়াবনত দোয়ায় আলস্য সৃষ্টি হয়। অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, অব্যাহত প্রচেষ্টার ভিত্তিতে আমাদের নিজেদের সামনে এই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, অবস্থা ভালো হোক বা মন্দ, স্বচ্ছলতা আসুক বা দীনতা, এই স্বাদ এবং এই আনন্দ লাভের চেষ্টা অব্যাহতভাবে করে যেতে হবে, যা এক নেশার আবেশ সৃষ্টি করে। শুধু ব্যক্তিগত অবস্থাই নয়, বরং সমাজের সার্বিক অবস্থাও মু'মিনের হৃদয়ে বেদনা সৃষ্টি করা উচিত আর এই বেদনাঘন পরিস্থিতির যখন উদ্ভব ঘটে, তখন বেদনার সাথে দোয়াও উদ্ভূত হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাকিস্তানে জামা'তী অবস্থা ভয়াবহ। চতুর্দিক থেকে জামা'তের সদস্যদের বিরুদ্ধে ঘৃণার তীর নিক্ষেপ করা হচ্ছে। হিংসা এবং বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে, মোল্লাদের ভয়ে বা তাদের কথায় সৃষ্ট ভুলধারণার কারণে জামা'তের সাথে যাদের পুরোনো সম্পর্ক, তারাও অনেক ক্ষেত্রে বিরোধীতায় সীমা অতিক্রম করছে। মোটের উপর, যুলুম এবং অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের সব আহমদীর যেভাবে উপভোগ্য নামায পড়ার চেষ্টা করা উচিত, একইভাবে মসজিদ আবাদ করার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া চাই।

সম্প্রতি খোদ্দামুল আহমদীয়া পাকিস্তানের পক্ষ থেকে শূরার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট এসেছে, যাতে তারা লিখেছে যে, সংখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে তরবিয়তী সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নে আমরা এই এই সাফল্য অর্জন করেছি। ভালো কথা, উন্নতির দিকে এক ধাপ অগ্রগতি হয়েছে। তরবিয়ত সংক্রান্ত অনেক কথার মাঝে একটি কথা ছিল, আমার 'খুতবা জুমুআ' শোনার প্রতি এত হাজার খোদ্দামের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে। অথচ চিন্তার বিষয় হল, বাজামা'ত নামাযে অভ্যস্ত লোকের সংখ্যা খুতবা জুমুআর শ্রোতাদের এক তৃতীয়াংশ বা এর চেয়ে কিছুটা বেশি ছিল। অনুরূপভাবে, নামাযে অভ্যস্ত খোদ্দামের সংখ্যাও খুতবা শ্রবণকারী খোদ্দামের চেয়ে অনেক কম। এমন খুতবা শুনে লাভ কী! যার ফলে আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের মনোযোগও নিবদ্ধ হয় না আর সেই মৌলিক দায়িত্বের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ হয় না, যা পালন একান্ত আবশ্যক।

যেভাবে আমি বলেছি, প্রত্যেক দ্বিতীয় বা তৃতীয় খুতবায় বাজামা'ত নামায বা ইবাদত সম্পর্কে আমি আলোচনা করে থাকি। যদি এর প্রভাব-ই না পড়ার থাকে, তাহলে শুধু সংখ্যার ঘর পূরণ করার মাঝে তো কোন মঙ্গল নেই। পাকিস্তানে আহমদীদের যেই অবস্থা বিরাজ করছে, যা আমি তুলে ধরলাম, এরপরও যদি খোদার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ না হয়, তবে কবে হবে? আমরা কি নাউযুবিল্লাহ্! খোদার পরীক্ষা নিতে চাই? অর্থাৎ, আমরা তো এমনই থাকব, এখন আমাদের অবস্থায় পরিবর্তন আনা খোদার দায়িত্ব। মনোবৃত্তি যদি এমনই হয়ে থাকে, তাহলে খোদার কাছে অভিযোগের কোন যৌক্তিকতা নেই। আল্লাহ্ কি এটি বলেছেন যে, তোমরা যা ইচ্ছে তাই কর, আমার প্রাপ্য দাও বা না দাও, তোমরা যেহেতু মসীহ্ মওউদকে গ্রহণ করেছ তাই আমি তোমাদেরকে সফলতা দান করব? সাফল্য লাভের জন্য নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থা খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত হওয়া উচিত।

খোদ্দামের রিপোর্টের কথা আমি উল্লেখ করেছি, এর অর্থ এই নয় যে, দুর্বলতা কেবল খোদ্দামের মাঝেই বিরাজমান, আনসারের অবস্থাও একই। তাই পাকিস্তানের সব আহমদীর এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করার প্রয়োজন। ঘুমিয়ে থাকলে সফলতা আসবে না। সীমান্তে ঘোড়া বাঁধায় আর সেনাঘাটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাফল্য লাভ হবে। পাকিস্তান থেকে যারা বাহিরে এসেছেন বা মোটের উপর জামা'তের সর্বত্র এবং এসব উন্নত বিশ্বেও এবং বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও তাদের একই অবস্থা। আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, বাহিরে এসে মানুষ খুব নামাযী হয়ে গেছে বা সর্বত্র মানুষ নামাযী। জামা'তের অবস্থা খতিয়ে দেখলে নামাযের ক্ষেত্রে দুর্বলতা সর্বত্র পরিলক্ষিত হবে। প্রতিটি সংগঠন যদি ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে পৃথিবীর সকল দেশে আত্মবিশ্লেষণ করে, ফলাফল নিজ থেকেই সামনে এসে যাবে। তবে পাকিস্তানের বাহিরে যারা এসেছেন, তাদেরকে বিশেষভাবে এদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, এর জন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করা উচিত। সেই কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ কিভাবে করবে?

কোন কোন জামা'তে নামাযের উপস্থিতি ভালো, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন না কোন ব্যক্তির কোন না কোন নামায ছুটে যাচ্ছে। কেউ কেউ এমন আছে, যারা কোন কোন সময় দু-একটি নামায পড়ে না বা তাদের নামায ছুটে যায়। এর একটিই কারণ, যেভাবে আমি বলেছি, ব্যবস্থাপনা এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। ব্যবস্থাপনাও অন্যান্য বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেয়।

প্রথমতঃ আমার খুতবা সবাই শুনে না। শতভাগ মানুষ খুতবা শুনে, এ কথা বলাও ভুল। আর শুনলেও সবসময় স্মরণ করাতে থাকা জামা'তী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। ব্যবস্থাপনা এ জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেন তরবিয়তের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে।

সম্প্রতি এখানকার এক জামা'তের মজলিসে আমেলার সাথে আমার মিটিং ছিল, প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, যখন থেকে আমি দায়িত্ব নিয়েছি, আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রতি আমরা গভীর মনোযোগ

নিবদ্ধ করেছি আর এখন আমরা এ ক্ষেত্রে খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছি। আমি বললাম, আপনি যে চেষ্টা করেছেন, তা ঠিক আছে কিন্তু এক মু'মিনের জন্য যে বিষয়টি মৌলিক ও আবশ্যিক, তা হল নামায। এর জন্য আপনি কী উদ্যোগ নিয়েছেন? আমার প্রশ্নের উত্তরে ছিল নীরবতা। ফজর ও এশার নামাযের উপস্থিতি সম্পর্কে আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম, তখন এর যে পরিসংখ্যান সামনে এলো, তা ভালোই ছিল কিন্তু এতে ব্যবস্থাপনার কোন ভূমিকা ছিল না। নামায উপভোগকারী নামাযী যদি সৃষ্টি হয়, তাহলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিজ থেকেই ঠিক হয়ে যাবে। কেননা, তাকওয়ার মান উন্নত হলে আর্থিক কুরবানীর প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। শুধু তা-ই নয়, বরং নামায সঠিকভাবে আদায় করা হলে উমুরে আমা ও কাযা বিভাগের যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে, তারও অনেকাংশে সমাধান হয়ে যায়। বরং সবাই যদি সঠিকভাবে নামায পড়া আরম্ভ করে, তবে অন্যান্য কর্ম-বিভাগও সক্রিয় হয়ে উঠবে।

আজকাল কেবল পাকিস্তানেই নয়, পৃথিবীর সার্বিক পরিস্থিতি এমন যে, যুদ্ধ এবং ধ্বংসের আশঙ্কা খুবই দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন সরকারও এ বিষয়ে আশঙ্কা ব্যক্ত করছে আর যতটা সম্ভব তারা ব্যবস্থা নেয়াও আরম্ভ করেছে। এমন পরিস্থিতিতে ঐশী আশ্রয়ই মানুষকে সুরক্ষা দিতে পারে।

অনেক মানুষ লিখে, যুদ্ধ আরম্ভ হলে কী হবে, আমাদের করণীয় কী? তাদের জন্য উত্তর হল, এসব বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, মহাবিশ্বের মালিক প্রভুকে ভালোবাসতে হবে আর তাঁকে ভালোবাসার একটাই রীতি আর তা হল, নিজেদের নামায এবং ইবাদতগুলো তাঁর নির্দেশের অধীনে আদায় করে তা উপভোগ করা এবং তা থেকে স্বাদ পাওয়ার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে।

এসব দেশে এসে অধিকাংশ মানুষ জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বচ্ছলতা পেয়ে আল্লাহ্ তা'লাকে ভুলে যায়। তাদের ধারণা অনুসারে এই স্বাচ্ছন্দ্য এ সব দেশের সমৃদ্ধির কল্যাণেই তাদের লাভ হয়েছে। আর তাদের মাথায় এমন ধারণা দানা বাধে যে, এরা এত উন্নত কিন্তু এদের এমন কোন্ আমল রয়েছে এবং এমন কোন্ ইবাদত করে, যার জন্য এরা এত উন্নতি করছে? আর কেউ কেউ এটিও চিন্তা করে যে, আমরা তো এদের চেয়ে কিছুটা হলেও ভালো, পাঁচ বেলার ফরয নামাযের মধ্যে থেকে দুই-তিন বেলার নামায তো আমরা পড়েই নেই। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, যারা খোদাকে ভুলে যায়, তাদের জন্য পরিণতিতে শাস্তি অবধারিত। অতএব, এদের অনুকরণ করবেন না, খোদার শাস্তি থেকে যদি রক্ষা পেতে হয় আর আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে যদি বাঁচাতে হয়, তাহলে তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখবেন না বরং সেই শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করুন, যা আল্লাহ্ আমাদের কাছে চান।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর স্বীয় সত্তায় ঈমান আনার নির্দেশ দেয়ার পর নামায প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, প্রত্যেক আহমদী নর-নারীর নিজেদের নামাযের হেফাজত করা আর বিশেষ করে পুরুষদের বাজামা'ত নামায পড়ার প্রতি সুগভীর দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক।

এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নামাযের গুরুত্ব, নামায পড়ার রীতি, নামাযের দর্শন সম্পর্কে সুস্পষ্ট করে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অনুগ্রহবশত: তাঁকে (আ.) মানার তৌফিক আমাদেরকে দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা মৌলিক সেই শিক্ষা অনুসরণ না করলে, যেভাবে আমি বললাম, আমরাও যদি অধিকাংশ অ-আহমদীর মত দু-তিন বেলার নামায পড়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাই, তাহলে এই বয়আত করায় কোন লাভ নেই।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে নামাযের ক্ষেত্রে কোন পর্যায়ে বা কোন মানে দেখতে চান? এই প্রেক্ষাপটে তিনি আমাদেরকে কীভাবে বুঝিয়েছেন, তা স্পষ্ট করার জন্য তাঁর কিছু উক্তি তুলে ধরছি– একজন মু'মিন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কলেমা পাঠ করে একত্ববাদের ঘোষণা দেয়। তৌহীদ বা একত্ববাদ কাকে বলে? এই সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন: "অতএব, ভালোভাবে স্মরণ রেখো এবং পুনরায় স্মরণ রেখো! আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যের সামনে বিনত হওয়া খোদার সাথে বিচ্ছেদ ঘটানো" (আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা)। নামায ও তৌহীদ বা একত্ববাদ যা-ই হোক" (তিনি নিজে বলেন, তৌহীদের ব্যবহারিক বহিঃপ্রকাশই নামায, মৌখিকভাবে একত্ববাদের দাবি তো করাই হয় কিন্তু একত্ববাদের ব্যবহারিক বহিঃপ্রকাশের নাম হল, নামায।) নামায ও একত্ববাদ যা-ই হোক..., এটি তখনই কল্যাণশূণ্য ও অলাভজনক হয়ে যায়, যখন এতে আত্ম-বিলুপ্তি, বিনয়ের প্রেরণা এবং নিষ্ঠাপূর্ণ অন্তর না থাকে। তিনি (আ.) বলেন, "শোন! সেই দোয়া যার জন্য 'উদ'উনি আসতাজিব লাকুম' বলা হয়েছে।" (অর্থাৎ, আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।) "এর জন্য সত্যিকার এই প্রেরণাই আবশ্যক।" ('উদ'উনি আসতাজিব লাকুম'-এর জন্য এই সত্যিকার প্রেরণাই শর্ত) "এই আকুতি-মিনতি আর বিগলনের মাঝে যদি সত্যিকার প্রেরণা না থাকে, তাহলে তা তোতার বুলির চেয়ে বেশি কিছু নয়। (মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১২, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত) (অর্থাৎ, তোতা পাখির কথা বলার ন্যায় কথাই হবে এটি।) সত্যিকার প্রেরণা এবং চেতনা সৃষ্টি করতে হবে। আকুতি-মিনতি ও বিগলন আবশ্যক, এটি না থাকলে কোন লাভ নেই।

অতএব, পূর্বেও যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দোয়ার মাঝে যদি বিনয় এবং বিগলন ও আকুতি-মিনতি থাকে, তবেই কেবল খোদার কৃপারাজী বর্ষিত হয়। পুনরায় তিনি এটিই স্পষ্ট করেছেন যে, নামাযে বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে, যেমন কেয়াম, রুকু, সেজদা– এই সব অবস্থা একটি ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠার এক চিত্র তুলে ধরে। কখনো মানুষ উঠে, কখনো

নামায হল দোয়ারই আরেক নাম। তাই তোমরা এতে দোয়া কর, যেন তিনি তোমাদেরকে ইহকাল ও পারকালের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন এবং তোমাদের পরিণতি যেন শুভ হয় আর তোমাদের সকল কাজ যেন তাঁর ইচ্ছার অধিনস্থ হয়। নিজের স্ত্রী-সন্তানের জন্য দোয়া কর। পুণ্যবান হও, সকল প্রকার পাপ পরিহার করে চল।

বসে, কখনো সেজদা করে আর এই অবস্থার কারণে বাহ্যিক এক ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, এই অবস্থার কারণে হৃদয়ে ব্যাকুলতার প্রদাহ এবং উৎকণ্ঠা বিরাজ করা উচিত আর হৃদয়ে এমন ব্যাকুলতাই সৃষ্টি হওয়া চাই। আর অবস্থা যখন এমন হবে, তখন সেজদায়, কিয়ামে, রুকুতে আনন্দ অনুভূত হবে, প্রফুল্ল হয়ে উঠবে মন-প্রাণ।

এরপর প্রকৃত বান্দার মর্যাদা এবং প্রকৃত বিনয় পাপকে জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করে, এমন নামায সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, "মানুষের আত্মা যখন বিগলনে আত্মবিলীনতার মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠে (অর্থাৎ, সর্বদা বিনয় এবং নিজ সত্তাকে কিছুই মনে না করার অবস্থা হয়ে যায়) "তখন খোদার পানে তা এক ঝর্ণা ধারার ন্যায় প্রবাহিত হয়।" (বিনয় সৃষ্টি হলেই খোদার পানে প্রবাহিত হবে) "এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবার সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় আর তখনই খোদার ভালোবাসা তার প্রতি নাযেল হয়।" মানুষ যখন সচেষ্ট হয়ে খোদার কাছে কৃপা যাচনা করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তখন খোদার ভালোবাসা তার প্রতি বর্ষিত হয়। আর খোদার এই ভালোবাসা যখন মানুষের উপর বর্ষিত হয়, পাপ তখন জ্বলে-পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায় আর নামাযেও সে এক স্থায়ী আনন্দ লাভ করে। (মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১০, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

তাই অভিযোগ করার পরিবর্তে বা এই ধারণা হৃদয়ে স্থান দেয়ার পরিবর্তে যে, নামাযে আমরা স্বাদ পাই না, আমাদেরকে খোদা তা'লার সাথে বিশেষ সম্পর্ক-বন্ধন রচনার চেষ্টা করা উচিত। নিজেদের অবস্থা বিশ্লেষণ করুন। আমরা কী শুধু মুরগির আধার খাওয়ার মত ঠোকর দিয়ে চলছি, না-কি প্রকৃত অর্থেই নামায পড়ছি? এরপর নামাযে নূর বা জ্যোতি ও স্বাদ লাভ সম্পর্কে তিনি (আ.) আরো স্পষ্ট করে বলেন, "যথাবিহিত নামাযের ব্যবস্থা করা এবং রীতিমত নামায পড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যাতে করে প্রথমত তা স্থায়ী ও বদ্ধমূল অভ্যাসে পরিণত হয়।" (তা যেন একটি পোক্ত অভ্যাসে রূপ নেয়) "আর হৃদয়ে যেন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের চিন্তা থাকে," (হৃদয়ে যদি আল্লাহ্ তা'লার দিকে ফিরে যাওয়ার চিন্তা থাকে আর তা যদি পোক্ত অভ্যাসে পরিণত হয়) তাহলে ধীরে ধীরে এমন সময় আসে, যখন মানুষ অপরাপর থেকে পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার ফলে এক জ্যোতি ও স্বাদের উত্তরাধিকারী হয়ে যায়।" (মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১১, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

মানুষ যখন জাগতিক বিষয়াদির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে খোদামুখী হয়, তখন খোদার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয় এবং নামাযের মাঝে সেই স্বাদ ও আনন্দ সৃষ্টি হতে শুরু করে।

অতএব, প্রথমে নামাযের অভ্যাস সৃষ্টি করা আবশ্যক। রীতিমত নামায পড়া আবশ্যক, বাহ্যত এর কোন কল্যাণ সামনে আসুক বা না আসুক, নামায পড়তে হবে। কেননা, এটি ফরয। আর এ চিন্তা মাথায় রেখে অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে যে, সর্বাবস্থায় আমাকে খোদার নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে আর সকল প্রয়োজনে তাঁর কাছেই চাইতে হবে। এই অবিচলতা বিরাজমান থাকলে একটি সময় এমন আসবে, যখন নামাযের প্রতিটি শর্ত পূর্ণতা পেতে শুরু করবে আর নামায উপভোগ্য হয়ে উঠবে। জিজ্ঞেস করলে অনেকেই যেভাবে উত্তর দেয়, তারা আর এই উত্তর দিবে না যে, আমি চেষ্টা করি নামায পড়ার, কিন্তু অলসতার শিকার হয়ে যাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার বলেন, "আলস্য তখনই প্রকাশ পায়, যখন নামাযের গুরুত্ব মাথায় থাকে না।" (মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৬-৭, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত) আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদেরকে মানুষ বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। খোদার সত্তায় যদি পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তাহলে এটি সম্ভবই নয় যে, মানুষ আলস্যের শিকার হবে। অতএব, আজকে পৃথিবী যে অবস্থার শিকার, এর কুফল থেকে নিজেদের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষার জন্য বিশুদ্ধ চিত্তে খোদার সামনে বিনত হওয়া আবশ্যক। আর এই বিনত হওয়ার সর্বোত্তম উপায় আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) এবং এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটাই বলেছেন যে, নিজেদের নামায আদায় কর এবং এর হেফাজতের প্রতি মনোযোগী হও।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, "স্মরণ রেখো! এই জামা'তভুক্ত হওয়ার পিছনে বস্তুবাদিতা যেন উদ্দেশ্য না হয়, বরং খোদার সন্তুষ্টি যেন লক্ষ্য হয়। কেননা, জগৎ হল কাটিয়ে দেয়ার জায়গা, তা তো কোন না কোনভাবে কেটেই যাবে।" ফার্সীর একটি প্রবাদ রয়েছে। তিনি লিখেছেন যে, 'শাব তানুর গুযাশ্‌ত ওয়া শাব সামুর গুযাশ্‌ত' (অর্থাৎ, রাত শীতের হোক বা গ্রীষ্মের, তা তো কেটেই যায়। অবস্থা ভাল হোক বা মন্দ, তা তো কেটেই যায়।) তিনি (আ.) বলেন, "এই বস্তুজগৎ এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে পৃথক রাখ, ধর্মের সাথে তা সম্পৃক্ত করো না। কেননা, ইহজগৎ

নিশ্চিহ্ন হবে আর ধর্ম এবং এর প্রতিফল স্থায়ী হয়ে থাকে। এই পৃথিবীর জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। তোমরা জান যে, প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি ক্ষণেই সহস্র সহস্র মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন মহামারী এরং রোগ পৃথিবীকে ধ্বংস করছে। কখনো কলেরা আর কখনো প্লেগ ধ্বংস করছে" (সে যুগে প্লেগ ছিড়িয়ে পড়েছিল) "কেউ জানে না, কে কতদিন জীবিত থাকবে। মৃত্যুর কথা যখন জানাই নেই যে কখন আঘাত হানবে, তখন এই সম্পর্কে উদাসীন থাকা কত বড় ভ্রান্তি। তাই পরকালের চিন্তা করা আবশ্যক। পরকাল সম্পর্কে যে চিন্তিত থাকবে, ইহজগতে আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি করুণাবারী বর্ষণ করবেন। খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, মানুষ যখন পূর্ণ মু'মিন হয়ে যায়, তখন তার এবং অন্যান্যদের মাঝে আল্লাহ্ একটি স্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করবেন, তাই প্রথমে মু'মিন হয়ে যাও। আর এটি তখনই সম্ভব, যদি বয়আতের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্থাৎ, খোদা-ভক্তি ও তাকওয়ার সাথে জাগতিক উদ্দেশ্যকে সম্পৃক্ত না কর। রীতিমত যথাসময়ে নামায পড়, তওবা, ইস্তেগফারে রত থাক, মানব জাতির প্রাপ্য অধিকার প্রদান কর, কাউকে দুঃখ দিও না, সততা এবং পবিত্রতার ক্ষেত্রে উন্নতি কর, তাহলে খোদা তা'লা সকল প্রকার কৃপাবারী বর্ষণ করবেন। মহিলাদেরকেও ঘরে নসীহত কর, তারা যেন রীতিমত নামায পড়ে, তাদেরকে অভিযোগ-অনুযোগ থেকে মুক্ত রাখ, পরচর্চা থেকে বিরত রাখ এবং তাদেরকে পবিত্রতা ও সততার শিক্ষা দাও। আমাদের দায়িত্ব কেবল বুঝানো আর তা মেনে চলার দায়িত্ব তোমাদের। (মলফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪৫-১৫৬, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

অন্যদের, মহিলাদের বা শিশুদের বুঝানোর জন্য নিজেকে প্রথম পবিত্র চেতা ও পুণ্যবানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

এরপর তিনি (আ.) আরো বলেন, "তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচ বেলার নামাযে দোয়া কর। নিজের ভাষায় দোয়া করা নিষেধ নয়। একাগ্রতা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত নামায উপভোগ্য হয় না" (অর্থাৎ, একনিষ্ঠ মনোযোগ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত) "আর বিনয় ছাড়া একাগ্রতা সৃষ্টি হয় না। আর বিনয় সৃষ্টি হয় তখন, যখন মানুষ বুঝে যে, সে কী পড়ছে। তাই নিজের ভাষায় নিজের আবেদন ও নিবেদন পেশ করার জন্য আবেগ এবং ব্যাকুলতা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এর অর্থ মোটেও এটি করা উচিত নয় যে, নামায নিজের ভাষায় পড়তে হবে। বরং আমার কথার অর্থ হল, মসনুন দোয়া এবং যিকরে এলাহীর পর নিজের ভাষায়ও দোয়া কর। নতুবা নামাযের নির্ধারিত এসব বাক্যের মাঝে আল্লাহ্ তা'লা এক বরকত বা আশিস রেখে দিয়েছেন। নামায হল দোয়ারই আরেক নাম। তাই তোমরা এতে দোয়া কর, যেন তিনি তোমাদেরকে ইহকাল ও পারকালের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন এবং তোমাদের পরিণতি যেন শুভ হয় আর তোমাদের সকল কাজ যেন তাঁর ইচ্ছার অধিনস্ত হয়। নিজের স্ত্রী-সন্তানের জন্য দোয়া কর। পুণ্যবান হও, সকল প্রকার পাপ পরিহার করে চল।" (মলফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪৫-১৪৬, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে নামাযের হিফাজতের আর রীতিমত নামায পড়ার এবং বিশুদ্ধ চিত্তে খোদার সন্তুষ্টির জন্য নামায পড়ার তৌফিক দান করুন। আমাদের নামাযে আল্লাহ্ তা'লা এক স্বাদ এবং আনন্দ রেখে দিন। আমরা যেন কখনোই এ ক্ষেত্রে আলস্য প্রদর্শন না করি। আর আমরা যেন এ কথার প্রকৃত মর্ম বুঝি যে, বর্তমান বিশ্বের বিপদ-আপদ ও সমস্যাবলী থেকে তখনই আমরা মুক্তি পেতে পারি, যখন আমরা খোদার দাসত্বের দায়িত্ব সত্যিকার অর্থে পালন করব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দিন।

(সূত্রঃ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০-১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, ২৪তম খণ্ড, সংখ্যা ৬, পৃ. ৫-৮)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

জুমুআর খুতবা

নামাযের কতিপয় নিয়মাবলী

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ২৭ জানুয়ারি, ২০১৭ মোতাবেক ২৭ সুলাহ্ ১৩৯৬ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত খুতবায় আমি নামাযের গুরুত্ব এবং নামায আদায়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম। এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের পর আমার কাছে অনেকের ব্যক্তিগত চিঠি এসেছে আর তারা নিজেদের আলস্যের জন্য অনুশোচনা ব্যক্ত করেছে। অনেক জায়গা থেকে জামা'তের ব্যবস্থাপনা ও অঙ্গ সংগঠনের পক্ষ থেকে পত্র এসেছে যে, সত্যিই এ বিষয়ে আলস্য রয়েছে, ভবিষ্যতে এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ থাকবে এবং তারা যথাসম্ভব ভালো প্রোগ্রাম হাতে নিচ্ছেন আর ভবিষ্যতে তারা আলস্য দূর করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। আল্লাহ্ তা'লা এদের সবাইকে তৌফিক দিন আর আমাদের মসজিদগুলোয় যেন আবাদ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু ব্যবস্থাপনাকে সবসময় স্মরণ রাখতে হবে যে, সব কাজের উত্তম ফলাফল লাভের জন্য শর্ত হল অবিচল-দৃঢ়তা। আমাদের মাঝে অনেকেই এমন আছে, যারা প্রথম দিকে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে কাজ আরম্ভ করে, কিন্তু কিছু দিন পর পুনরায় আলস্য মাথাচাড়া দেয়। আসলে মানব প্রকৃতিই এমন। ব্যক্তির আলস্য ততটা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে না, যদিও এটাও অত্যন্ত চিন্তার কারণ, তবে ব্যবস্থাপনার মাঝে আলস্য সৃষ্টি হওয়া চরম ভয়াবহ এক বিষয়।

ঘরে সন্তানদের নামাযের প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাদেরকে নামাযে অভ্যস্ত করা, পুরুষ এবং যুবকদের মসজিদে যাওয়ার জন্য অব্যাহতভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকা- এগুলো মহিলাদের কাজ। মহিলারা যদি এক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে, তাহলে অসাধারণ এক পরিবর্তন আসতে পারে।

ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যবস্থাপনাই যদি অলস হয়ে যায় বা নিজের কাজে আলস্য দেখাতে শুরু করে, তাহলে ব্যক্তির সংশোধন কঠিন হয়ে পড়ে। মানুষের মাঝে আলস্য চলে আসাটা যেহেতু মানব-প্রকৃতির অধীন একটি ব্যাপার, তাই এমতাবস্থায় তার সংশোধন কঠিন হয়ে যায়।

অতএব, অঙ্গ-সংগঠন এবং জামা'তী ব্যবস্থাপনা নিজেদের কাজের জন্য, বিশেষ করে সেই কাজ, যাকে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হিসেবে অভিহিত করেছেন, সে বিষয়ে এমন পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন এবং এমন কার্যক্রম হাতে নিন, যেন তা কালের প্রবাহে আলস্য এবং দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়ার পরিবর্তে প্রতিদিন উন্নতির পানে ধাবিত করে। ইবাদতের ক্ষেত্রে অগ্রগতি আর উন্নতিই আমাদের জন্য সাফল্য বয়ে আনবে। তাই এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ব্যবস্থাপনার প্রতিটি বিভাগের উচিত, এ বিষয়ে খুবই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে পরিকল্পনা হাতে নেয়া। লাজনা ইমাইল্লাহ্‌রও এক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করা উচিত।

ঘরে সন্তানদের নামাযের প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাদেরকে নামাযে অভ্যস্ত করা, পুরুষ এবং যুবকদের মসজিদে যাওয়ার জন্য অব্যাহতভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকা– এগুলো মহিলাদের কাজ। মহিলারা যদি এক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে, তাহলে অসাধারণ এক পরিবর্তন আসতে পারে।

অনুরূপভাবে, এখানে আমি এমন লোকদের দৃষ্টিভঙ্গিরও সংশোধন করতে চাই, যারা বলে যে, আমাদেরকে নামাযের জন্য বলবে না বা এ সম্পর্কে জিজ্ঞেসও করবে না কেননা, এটি আমাদের এবং আল্লাহ্ তা'লার মধ্যকার বিষয়। অনেক মহিলার পক্ষ থেকে এমর্মে অভিযোগ আসে যে, আমরা স্বামীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তারা তর্ক ও ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ করে দেয়। এমন লোকদেরকে আমি বলব, নিঃসন্দেহে এটি তার এবং খোদারই বিষয়, তথাপি এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং জিজ্ঞেস করা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। আর স্ত্রীদের জন্যও এটি দায়িত্ব, বরং এরূপ করা তাদের জন্য আবশ্যিকই হয়ে থাকে। বিষয়টি যদি এমন হতো যে– আমাদের ইচ্ছে হলে নামায পড়ব, না হলে পড়ব না, অথবা ফযরের সময় আমাদের গভীর ঘুম আসে, সারাদিন যেহেতু ক্লান্ত থাকি, তাই রাতে ঠিকমত ঘুম আসে না, তাই ফযরে জাগাবে না। এটি যদি কেবল ইচ্ছা-মাফিক ব্যাপারই হতো, তাহলে মহানবী (সা.) কখনো স্বামী-স্ত্রীকে এই নির্দেশ দিতেন না যে, নামাযের জন্য প্রথমে যে জাগ্রত হয়, সে যেন অপরজনকেও জাগায় আর যদি না জাগে এবং আলস্য দেখায়, তাহলে পানির ছিটা দিবে। কোন কোন স্থানে তিনি আরো বেশি কঠোরতা প্রদর্শন করেছেন। গত জুমুআয় আমি কিছু হাদীসও উপস্থাপন করেছিলাম। অতএব, এমন ধারণা ভ্রান্ত যে, আমরা এই বিষয়ে স্বাধীন, এটি আমাদের এবং খোদার বিষয়। যে ব্যবস্থাপনার সাথে আপনি নিজেকে সম্পৃক্ত করছেন, সেই ব্যবস্থাপনা যদি নামায আদায় সম্পর্কে জানার জন্য জিজ্ঞেস করে, তো সেক্ষেত্রে রাগ করার বা বিরক্ত হওয়ার পরিবর্তে সহযোগিতা করা উচিত। হ্যাঁ! কেউ যদি নামায পড়ে আর মানুষজনকে বলে বেড়ায় আর গর্বের সাথে এটি প্রচার করে যে, 'আমি বাজামা'ত নামায পড়ি', তাহলে তা মন্দ কাজ এবং একটি ভ্রান্ত-রীতি। যাহোক, নামাযের গুরুত্ব সবার সামনে স্পষ্ট হওয়া উচিত আর এ জন্য যথাবিহিত প্রস্তুতির সাথে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে কাজ করা উচিত।

এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের পর, এখন আমি নামায সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উক্তির আলোকে কিছু বিষয় উপস্থাপন করব, যা সচরাচর ফিকাহ বা মাসলাহ্-মাসায়েলের সাথে সম্পর্ক রাখে অথবা যে বিষয়ের দিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একজন আহমদীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, এগুলো তার মেনে চলা উচিত। মানুষ প্রায়শঃ এগুলো সম্পর্কে জানতে চায়, তাই এটি তুলে ধরাও প্রয়োজন।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মুসলমানদের বিভিন্ন ফির্কা থেকে মানুষজন এসে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে যোগ দেয়। কিছু কাজ, যা তারা পূর্বে একভাবে করত, জামা'তে আহমদীয়া তা সেভাবে অনুসরণ করে না। কেননা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমদেরকে যেসব কথা বলেছেন আর আমরা যেহেতু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে হাকাম ও আদল হিসেবে গ্রহণ করেছি, তাই তিনি যা বলেছেন, সে অনুসারেই আমাদের কাজ করতে হবে। বিশেষ করে মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবাদের পক্ষ থেকেও যখন তা প্রমাণিত। 'রাফা ইয়াদাইন'-এর বিষয়টিও সে বিষয়গুলোর একটি। অর্থাৎ, নামাযের প্রত্যেক তাকবীরে এবং প্রত্যেক অবস্থার পরিবর্তন কালে কান পর্যন্ত হাত উঠানো। এসব ছোট ছোট বিষয়ই মুসলমানদেরকে দলে উপদলে বিভক্ত

করেছে। কেবল তা-ই নয়, বরং তা ঝগড়া-বিবাদে এবং একে অপরকে কাফের আখ্যা দেয়ায় পর্যবসিত হয়েছে। এক ফির্কার কেউ অন্য ফির্কার ইমামের পেছনে সেই ফির্কার কারও জানাযা পড়লে বলে বসে যে, এর বিয়ে ভেঙ্গে গেছে। আর এগুলো কেবল পুরোনো কাহিনী নয়, বরং আজও এমন বিষয়াদি অহরহ ঘটছে। সম্প্রতি ভারত থেকে একটি সংবাদ এসেছে যে, এক ফির্কার মানুষ অন্য ফির্কার ইমামের পিছনে কারও জানাযা পড়েছে। এর ফলে ফতোয়া দেয়া হয়েছে যে, এদের বিয়ে ভেঙ্গে গেছে। এরপর পুরো গ্রাম একত্রিত হয়ে সেই মৌলভীর কাছে যায় আর নতুনভাবে বিয়ের এলানের লাইন লেগে যায়। এভাবে এরা ধর্মকে হাসি-ঠাট্টার বস্তুতে পরিণত করেছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), যিনি সকল ঝগড়া-বিবাদ নিরসনের জন্য এসেছেন, তিনি নিজেও বলেন যে, 'আমি হাকাম এবং আদাল' তিনি এর সমাধান তুলে ধরেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ে সামান্য পার্থক্য ছিল, তিনি সেগুলোর উভয়টিকে বৈধ আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ, এভাবেও করা যায়, আবার ওভাবেও করা যায়। অতএব, 'রাফা ইয়াদাইন' বা হাত উঠানো সম্পর্কে তিনি বলেন, "এতে কোন অসুবিধা নেই। কেউ এটি অনুসরণ করুক বা না করুক– এতে কোন অসুবিধা আছে বলে মনে হয় না। হাদীসে উভয়টিরই উল্লেখ আছে। ওহাবী এবং সুন্নীদের রীতি থেকেও এ ফলাফলই দাঁড়ায়। তাদের একপক্ষ হাত উঠান, অন্যপক্ষ হাত উঠান না। মনে হয়, মহানবী (সা.) কখনো হাত উঠিয়েছেন আর পরবর্তীতে তা পরিত্যাগ করেছেন।" (আল বদর, ১৩ এপ্রিল, ১৯৯৩, ২য় খণ্ড, সংখ্যা ১১, পৃ. ৮৫) এটি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর স্থায়ী রীতি ছিল না। কিন্তু যেহেতু কোন এক সময় এটি করেছেন এবং কেউ কেউ তা অনুসরণও করেন, তো ঠিক আছে, এটি নিয়ে ঝগড়া-বিবাদের তো কোন প্রয়োজন নেই। তবে তিনি (আ.) সেই রীতিকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন, যার উপর মহানবী (সা.) জীবনের বেশিরভাগ সময় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

এ সংক্রান্ত একটি রেওয়ায়েত বা ঘটনাও রয়েছে। হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লেখেন, ফয়জুল্লাহ্ চক নিবাসী হাফেয নূর মোহাম্মদ সাহেব আমাকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন, একবার আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জিজ্ঞেস করি যে, হুযূর! ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া, রাফা ইয়াদাইন এবং জোরে 'আমীন' বলা সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি বলেন, হাদীস থেকে এগুলোর প্রমাণ পাওয়া যায়, তাই অবশ্যই করা উচিত। হযরত সাহবেজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বলেন, এই অধম নিবেদন করছে যে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার স্থায়ী রীতি রয়েছে, বাজামা'ত নামাযে ইমামের পিছনে মুক্তাদিকে অবশ্যই সূরা ফাতেহা পড়তে হয়। কিন্তু 'রাফা ইয়াদাইন' বা হাত উঠানো আর জোরে 'আমীন' বলা সম্পর্কে হুযূর (আ.) এমনটি বলেছেন বলে আমি মনে করি না। হুযূর যদি এটি বলতেন, তাহলে নিজেও সবসময় তা অনুসরণ করতেন। কিন্তু হুযূর স্থায়ীভাবে এর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না বরং তাঁর সাধারণ রীতি এর বিপরীত ছিল। তিনি লিখেন, আমি মনে করি যে, হাফেজ সাহেব হুযূরকে যে প্রশ্ন করেছেন, তাতে যেহেতু বেশ কয়েকটি বিষয় ছিল, তাই হুযূর শুধু প্রথম কথাটি সামনে রেখে উত্তর দিয়েছেন। অর্থাৎ, হুযূর শুধু ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ করা সংক্রান্ত অংশেরই উত্তর দিয়েছেন। বাকি আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন। (সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, তৃতীয়াংশ, পৃ. ৫৬৪, বর্ণনা নম্বর-৫৯২)

পরবর্তী একটি ঘটনা থেকেও এই কথার অর্থাৎ, সূরা ফাতেহা অবশ্যই পড়তে হয়– এর সত্যায়ন হয় কিন্তু বাকিগুলোর নয়। সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, মিয়া আব্দুল্লাহ্ সাহেব সানৌরী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, প্রথম দিকে আমি কট্টর গায়ের-মুকাল্লেদ (যারা চার ইমামকে মানেন না– অনুবাদক) ছিলাম আর রাফা ইয়াদাইন ও জোরে আমীন বলা আবশ্যক মনে করতাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের পরও দীর্ঘদিন আমার এ রীতি অব্যাহত রেখেছি। বেশ কিছুকাল পর একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পিছনে যখন নামায পড়লাম, তখন নামাযের পর তিনি মুচকি হেসে আমাকে বললেন, 'মিয়া আব্দুল্লাহ্! এ রীতির অনুসরণ তো অনেক করলে।' এভাবে তিনি রাফা ইয়াদাইনের (অর্থাৎ প্রত্যেক তকবীরে হাত উঠানোর) প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। মিয়া আব্দুল্লাহ্ সাহেব বলেন, সেদিন থেকে আমি রাফা ইয়াদাইন করার রীতি ত্যাগ করেছি। বরং আমীন বিল জাহ্‌র বা জোরে আমীন বলাও পরিত্যাগ করেছি। মিয়া আব্দুল্লাহ্ সাহেব বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আমি কখনো রাফা ইয়াদাইন করতে বা জোরে আমীন বলতে শুনি নি আর বিসমিল্লাহ্‌ও জোরে পড়তে শুনি নি। (মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বলেন,) এই অধম নিবেদন করছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রীতি সেটিই ছিল, যা মিয়া আব্দুল্লাহ্ সাহেব বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেও আর তাঁর পরেও আহমদীদের মাঝে আজ পর্যন্ত এ রীতিই চলে আসছে যে, এসব বিষয়ে একজন আরেকজনকে জোর-জবরদস্তি করে না। অনেকেই জোরে আমীন বলে, অনেকেই বলে না। কেউ কেউ হাত উঠায়, অধিকাংশ আহমদী এমনটি করে না। (আর এখন তো শুধু দু'একজন নবাগত ব্যতীত আদৌ এটি করতে দেখা যায় না, যারা এতে অভ্যস্ত তারাও ধীরে ধীরে তা ছেড়ে দেয়।) তিনি আরো বলেন, কেউ কেউ জোরে বিসমিল্লাহ্ পড়ে, কিন্তু অধিকাংশই তা পড়ে না। হুযূর (আ.) বলতেন, আসলে এই উভয় রীতিই মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে প্রমাণিত। তবে যে রীতির উপর রসূলে করীম (সা.) সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সে রীতিই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অনুসরণ করেছেন। (সীরাতুল

মাহদী, ১ম খণ্ড, প্রথমাংশ, পৃ. ১৪৭-১৪৮, বর্ণনা নম্বর-১৫৪)

আরেকটি প্রশ্ন করা হয় যে, মানুষ যখন হাত বেঁধে নামাযে দণ্ডায়মান হয়, তখন হাত শরীরের কোন স্থানে রাখা উচিত? হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, মৌলভী সৈয়্যদ মুহাম্মদ সারওয়ার শাহ্ সাহেব আমাকে শুনিয়েছেন যে, একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছে এমর্মে কারো পত্র আসে যাতে, [কেননা, কিছু মানুষ নাভির নিচে হাত রাখে, অনেকেই মাঝে, অনেকেই আবার অনেক উপরে হাত বাঁধে। অতএব, এ বিষয়ে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছে পত্র আসে যে, হাত কীভাবে বা কোন স্থানে বাঁধা উচিত।] প্রশ্ন ছিল যে, নামাযে নাভির উপরে হাত বাঁধা সম্পর্কে কোন সঠিক হাদীস আছে কি? হযরত মৌলভী সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সামনে এই পত্র রাখেন এবং বলেন, এ সম্পর্কে যে হাদীস পাওয়া যায়, তা প্রশ্নাতীত নয়। (এর উপর তর্ক-বিতর্ক হয়ে থাকে, কেউ সঠিক বলে, কেউ বলে এগুলো ভ্রান্ত হাদীস।) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'মৌলভী সাহেব, আপনি সন্ধান করুন, অবশ্যই পেয়ে যাবেন। কেননা, [মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের কথা বলেন যে,] যদিও জীবনের প্রথম ভাগেও আমাদের চতুর্দিকে হানাফীরাই বসবাস করতো, কিন্তু নাভির নিচে হাত বাঁধা আমি কখনো পছন্দ করতাম না। নাভির নিচে হাত বেঁধে দণ্ডায়মান হওয়া আমার পছন্দ ছিল না, বরং সব সময় নাভির উপরে হাত বাঁধার প্রতি আমি আকৃষ্ট ছিলাম। [মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন,] আমরা বারবার এই অভিজ্ঞতাই লাভ করেছি যে, যে কথার প্রতি আমাদের আকর্ষণ থাকে, সন্ধান করলে হাদীসে তা অবশ্যই পাওয়া যায়। আমরা সে কথা পূর্বে জানি আর না-ই বা জানি। তিনি (আ.) খলীফা আউয়াল (রা.)-কে বলেন, 'আপনি সন্ধান করুন, এ সংক্রান্ত অবশ্যই হাদীস পাবেন। (কেননা, যেদিকে আমার আকর্ষণ থাকে, সে কথার সমর্থনে অবশ্যই হাদীস পাওয়া যায়।) মৌলভী সরোয়ার শাহ্ সাহেব বলেন যে, তখন মৌলভী সাহেব যান আর আধা ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই মহা আনন্দের সাথে একটি বই নিয়ে আসেন আর হুযূরকে সংবাদ দেন যে, হুযূর! হাদীস পেয়ে গেছি আর হাদীস 'আলা শর্তে শায়খাইন' অর্থাৎ, হযরত আবু বকর এবং উমর (রা.) উভয়ের পক্ষ থেকেই এর সত্যায়ন রয়েছে, তাই এই হাদীসটি প্রশ্নাতীত। এরপর বলেন, এটি হুযূরের উক্তিরই বরকত। [অর্থাৎ, এই হাদীস হস্তগত হয় যে, নাভির উপরে হাত বাঁধার অভ্যাসই মহানবী (সা.)-এর বেশি ছিল।] (সীরাতুল মাহ্দী, ১ম খণ্ড, প্রথমাংশ, পৃ. ৯২, বর্ণনা নম্বর-১১৫)

হযরত হাজী গোলাম আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে, নামাযে কোন জায়গায় হাত বাঁধা উচিত? [অনেকেই অপ্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম প্রশ্নাদি আরম্ভ করে। যাহোক, এক জায়গায় তো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, সন্ধান করুন, হাদীস পাবেন। কেননা, আমার মনে হয় নাভির উপরে হাত বাঁধাকে আমি পছন্দ করি। দ্বিতীয় জায়গায় আরেক ব্যক্তি এ প্রশ্ন করেন। সেখানে সংশোধন করা উদ্দেশ্য ছিল, তাই তাকে তিনি (আ.) বলেন,] নামাযের বাহ্যিক যে দিকগুলো রয়েছে, সেগুলো পালনের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন। (নামাযে বাহ্যিক দিগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াও চাই, এ কথা ঠিক) তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু নামাযে অধিক মনোযোগ আল্লাহ্‌র প্রতি নিবদ্ধ করা উচিত।" (আসহাবে আহমদ, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৪৬, নব সংস্করণ, ফিকাহুল মসীহ্, পৃ. ৭৭) এই বিষয়গুলোও সঠিক, তবে দৃষ্টি খোদার প্রতি নিবদ্ধ রাখ, এটিই মূল উদ্দেশ্য।

আরেকবার শাহাদতের আঙ্গুল উঠানো সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হয়। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, নামাযে আত্তাহিয়্যাত পড়ার সময় শাহাদত অঙ্গুল কেন উঠানো হয়? তিনি বলেন, অজ্ঞতার যুগে মানুষ গালি দেয়ার জন্য এই আঙ্গুল উঠাতো। (অর্থাৎ, কাউকে গালি দেয়ার জন্য এই আঙ্গুল উঠাত) এই কারণে এটিকে 'সাব্বাবা' বলা হয় অর্থাৎ, গালি দেয়ার আঙ্গুল। আল্লাহ্ তা'লা আরবদের সংশোধন করেন আর সেই অভ্যাস পরিবর্তন করে বলেন, আল্লাহ্‌কে এক-অদ্বিতীয় ঘোষণা করার সময় এই আঙ্গুল উঠাবে, যাতে করে এই আঙ্গুলের যে বদনাম রয়েছে, তা যেন দূরীভূত হয়। অর্থাৎ, গালি দেয়ার আঙ্গুল পরিবর্তিত হয়ে শাহাদতের অঙ্গুল হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। তিনি (আ.) বলেন, অনুরূপভাবে আরবের মানুষ দৈনিক পাঁচ বেলা মদ পান করত, সেই স্থান নিয়েছে পাঁচ বেলার নামায। (আল বদর, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৩, পৃ. ৬৬, ২য় খণ্ড, সংখ্যা ৯)

এছাড়া রুকু ও সেজদায় কুরআনের দোয়া পাঠ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। মৌলভী আব্দুল কাদের লুধিয়ানভী সাহেব প্রশ্ন করেন যে, রুকু এবং সেজদায় কুরআনের আয়াত বা দোয়া পাঠ করাকে হুযূর কোন দৃষ্টিতে দেখেন? তিনি বলেন, "সেজদা এবং রুকু বিনয়ের অবস্থা। আর আল্লাহ্ তা'লার বাণী এক মাহাত্ম্য চায়। এছাড়া হাদীসে কোথাও এর প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, মহানবী (সা.) রুকু এবং সেজদায় কুরআনের কোন দোয়া পড়েছেন। (আল হাকাম, ২৪ এপ্রিল, ১৯০৩, পৃ. ১১, ৭ম খণ্ড, সংখ্যা ১৪)

হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এ সম্পর্কে বলছেন, মিয়া খায়রুদ্দীন শিখওয়ানী সাহেব লিখিতভাবে আমাকে অবহিত করেছেন যে, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, নামাযে অজস্র ধারায় দোয়া করা উচিত। আর একই সাথে বলেন, নিজের ভাষায় দোয়া করা উচিত। কিন্তু যে সব বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, তা সেই ভাষাতেই পড়া উচিত। যেমন রুকুতে 'সুব্‌হানা রাব্বি আল আযীম', সেজদায় 'সুব্‌হানা রাব্বি আল আ'লা' ইত্যাদি পড়ে এরপর নিজের ভাষায় দোয়া করা যেতে পারে। একই সাথে তিনি আরো বলেন, সেজদা এবং রুকুতে কুরআনী দোয়া পড়া উচিত নয়। কেননা, কুরআন করীম খোদা তা'লার

পবিত্র বাণী আর তা এক সুমহান মর্যাদা রাখে। রুকু এবং সেজদা হল বিনয়ের অবস্থা, তাই আল্লাহ্‌র বাণীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত। (সীরাতুল মাহ্‌দী, ২য় খণ্ড, চতুর্থাংশ, পৃ. ১৬৬-১৬৭, বর্ণনা নম্বর-১২৪৩)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-কে কেউ একবার জিজ্ঞেস করেন যে, পরম বিনয়ের অবস্থা সত্ত্বেও সেজদায় কুরআনের দোয়া পড়া অবৈধ কেন? (অর্থাৎ, বিনয়ের অবস্থা, তাই এই অবস্থায় অবশ্যই দোয়া পড়া উচিত, যেন গৃহীত হতে পারে।) এর উত্তর দিতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, দীর্ঘকাল এই বিশ্বাসই আমার ছিল যে, সেজদায় কুরআনের দোয়া পড়া বৈধ, কিন্তু পরবর্তীকালে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এমন একটি উদ্ধৃতি পেয়েছি, যাতে তিনি সেজদায় কুরআনের দোয়া পাঠ করা অবৈধ আখ্যা দিয়েছেন। অনুরূপভাবে, মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলেও একই বিষয়সম্বলিত হাদীস পাওয়া গেছে। তিনি (আ.) বলেন, আমার বিশ্বাস-পরিপন্থী এমন কথা না পেলেও প্রশ্নকারী এ যুক্তিকে (অর্থাৎ, বিনয়ের অবস্থার যুক্তি দেখিয়ে তিনি যে প্রশ্ন করেছেন, তাকে) আমি যুক্তিযুক্ত আখ্যা দিতাম না অর্থাৎ, সেজদা যেহেতু পরম বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ, তাই সেজদায় কুরআনের দোয়া পাঠ করা বৈধ হওয়া উচিত। (এটি কোন প্রমাণ বা যুক্তি নয়। বিশদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি পুনরায় বলেন,) ইমাম মালেকের বিশ্বাস ছিল, সমুদ্রের সবকিছু হালাল বা বৈধ। একবার এক ব্যক্তি তার কাছে আসে এবং বলে, সমুদ্রে শুকরও বসবাস করে, সেই শুকরের মাংস খাওয়া কি বৈধ? এতে হযরত ইমাম মালেক বলেন, সমুদ্রের সবকিছু ভক্ষণ করা বৈধ, কিন্তু শুকর হারাম। সে ব্যক্তি বারবার একই প্রশ্ন করে আর তিনিও বলেন, এই প্রশ্নের আমি এই উত্তরই দিতে পারি যে, সমুদ্রের সবকিছুই বৈধ বা হালাল, কিন্তু শুকর হারাম বা অবৈধ। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলছেন যে, আমিও এই উত্তরই দিব যে, সেজদা নিঃসন্দেহে পরম বিনয়েরই অবস্থা, কিন্তু কুরআনের দোয়াগুলো সেজদার অবস্থায় পাঠ করা উচিত নয়। দোয়া বা সেজদা মানুষকে নিচের দিকে নিয়ে যায় আর কুরআন মানুষকে নিয়ে যায় উপরের দিকে। তাই সেজদার অবস্থায় কুরআনী দোয়া পাঠ করা অবৈধ। মহানবী (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে যখন একটি কথা আমরা পেয়েছি, তখন এর বিরুদ্ধে কোন রীতি অবলম্বন করা সঠিক নয়, তা আমরা বুঝতে পারি বা না-ই পারি। (আল ফযল, ১৬ এপ্রিল ১৯৪৪, পৃ.১-২, ৩২তম খণ্ড, সংখ্যা ৮৮) নির্দেশ যা রয়েছে, আমরা তো সে অনুসারেই কাজ করব।

অনেকেই রুকুতে এসে নামাযে যোগ দেয়। প্রশ্ন করে যে, এটি রাকাত হবে কি-না? প্রায় সবাই এটি জানে। শৈশব থেকেই এটি জানানো হয় যে, কেউ দেরিতে এসে রুকুতে যোগ দিলে তার রাকাত হয়ে যায়। এ বিষয়ে একবার প্রশ্ন করা হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি জামা'তে এসে রুকুর অবস্থায় যোগ দেয়, তার সেই রাকাত পূর্ণ হবে কি-না? [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেখানে উপবিষ্ট মৌলভী সাহেবানের কাছে অন্যান্য মৌলভীদের মতামত জানতে চান। বিভিন্ন ইসলামী ফির্কা বা সম্প্রদায় এ প্রসঙ্গে কী বলেছে, তা উদঘাটন করেন।) এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই সিদ্ধান্ত দেন। তিনি (আ.) বলেন, আমাদের বিশ্বাস হল, 'লা সালাতা ইল্লা বেফাতেহাতিল কিতাব'। মানুষ ইমামের পিছনে নামায পড়ুক বা একা নামায পড়ুক, সর্বাবস্থায় তার উচিত, সূরা ফাতিহা পাঠ করা। কিন্তু ইমামের উচিত থেমে থেমে পাঠ করা, যেন মুক্তাদি শুনতেও পায় আর পড়ারও সুযোগ পায়। (ইমামদেরকে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন যে,) প্রত্যেক আয়াত পাঠ করার পরে ইমামের এতটা বিরতি দেয়া উচিত, যেন মুক্তাদিও সেই আয়াত পাঠ করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পায়। মুক্তাদিকে শোনার এবং পাঠ করার সুযোগ দেয়া উচিত। সূরা ফাতিহা পাঠ করা আবশ্যক কেননা, সেটি উম্মুল কিতাব বা কিতাবের জননী। কিন্তু যেব্যক্তি নামাযে যোগ দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও শুধু রুকুই পায়, এর পূর্বে নামাযে যোগ দিতে পারে না, সূরা ফাতিহা না পড়লেও তার রাকাত হয়ে যাবে। কেননা, হাদীস শরীফে এসেছে, যে রুকু পায়, তার রাকাত হয়ে যায়। মসলা-মসায়েল দুই শ্রেণির বা দুই ধরণের হয়ে থাকে। এক জায়গায় হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন এবং তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন যে, নামাযে সূরা ফাতিহা অবশ্যই পাঠ কর কেননা, সেটি উম্মুল কিতাব আর সেটিই আসল নামায। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও আর তাড়াতাড়ি নামাযে যোগ দেয়ার চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও রুকুই পায়, তখন ধর্মের ভিত্তি যেহেতু সহজ-সাধ্যতার উপর, (আল্লাহ্‌র নির্দেশ রয়েছে ধর্মে সহজ-সাধ্যতা সৃষ্টি কর,) সেকারণে রসূল করীম (সা.) বলেছেন, তার রাকাত পূর্ণ হয়েছে বলে গণ্য হবে। এটি সূরা ফাতিহার প্রেক্ষাপটে নয়, বরং দেরিতে আসার কারণে যে একটি ছাড় রয়েছে, সেই ছাড়ের সুযোগ পায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন, আমার হৃদয় আল্লাহ্ তা'লা এমন বানিয়েছেন যে, অবৈধ কাজে আমি অস্বস্তি বোধ করি (অর্থাৎ, অন্তর তা করতে বাধা দেয়) আর আমার মনও সেটি করতে চায় না। এটি জানা কথা এবং স্পষ্ট কথা যে, এক ব্যক্তি নামাযের তিনটি অংশ পুরোপুরি পায়, কিন্তু একটি অংশে কোন বাধ্য-বাধকতার কারণে দেরিতে যোগ দিলে অসুবিধা কি? মানুষের জন্য যে ছাড় রয়েছে, তাকে সে সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। হ্যাঁ! যে ব্যক্তি জেনে-শুনে আলস্য দেখায় এবং দেরিতে নামাযে যোগ দেয়, তার তো নামাযই ত্রুটিযুক্ত। (আল হাকাম, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০১, পৃ. ৯, ৫ম খণ্ড, সংখ্যা ৭)

এরপর সূরা ফাতিহা সম্পর্কে অর্থাৎ, ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা উচিত, এই সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, হযরত মৌলভী শের আলী সাহেব আমাকে বলেছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কঠোরভাবে

একথার উপর জোর দিতেন যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদিরও সূরা ফাতিহা পাঠ করা আবশ্যক। কিন্তু একই সাথে এটিও বলতেন, সূরা ফাতিহাকে আবশ্যক মনে করা সত্ত্বেও আমি এ কথা বলবো না যে, কোন ব্যক্তি যদি সূরা ফাতিহা পাঠ না করে, তার নামায হয় নি বা হয় না। কেননা, অনেক পুণ্যাত্মা এবং ওলীউল্লাহ্ এমন অতিবাহিত হয়েছেন, যারা সূরা ফাতিহার তিলাওয়াত আবশ্যক মনে করতেন না। আর আমি তাদের নামাযকে অ-গ্রহণযোগ্য বা ত্রুটিপূর্ণ নামায মনে করি না। হযরত মিয়া বশীর আহমদ সাহেব বলেন, এই অধম নিবেদন করছে, হানাফীদের বিশ্বাস হল, ইমামের পিছনে মুক্তাদিকে নিরবে দাঁড়িয়ে তার তিলাওয়াত শুনা উচিত আর তার নিজের কিছু পড়া উচিত নয় আর আহলে হাদীসের বিশ্বাস হল, মুক্তাদির জন্য ইমামের পিছনেও সূরা ফাতিহা পাঠ করা আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই বিষয়ে আহলে হাদীসের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু এই বিশ্বাস সত্ত্বেও তিনি আহলে হাদীসদের মত এটি বলেন না যে, কোন ব্যক্তি যদি সূরা ফাতিহা পাঠ না করে, তার নামায হয় না।" (সীরাতুল মাহ্দী, ১ম খণ্ড, দ্বিতীয়াংশ, পৃ. ৩৩৪-৩৩৫, বর্ণনা নম্বর-৩৬১)

মুন্সী রুস্তম আলী সাহেবের এক প্রশ্নের উত্তরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পত্রে লিখেছেন, মুক্তাদির নামায সূরা ফাতিহা ছাড়াও হয়ে যায়, কিন্তু সূরা ফাতিহা পাঠ করাই শ্রেয়। কোন ইমাম যদি দ্রুত তিলাওয়াতকারী হয়ে থাকে, তাহলে মুক্তাদি এক বা দু'টো আয়াত যতটা সম্ভব ক্ষীণ কণ্ঠে পড়া উচিত। (ইমাম দ্রুত পড়লেও, মুক্তাদিরা দু'টি বা একটি যতটাই সম্ভব পড়ে নেয়া উচিত।) কিন্তু ইমামের কিরাত শুনার পথে তা যেন বাদ না সাধে (অর্থাৎ, উচ্চস্বরে পড়া যাবে না, যাতে ইমামের তেলাওয়াত শোনা না যায়) আর যদি সম্ভব না হয়, তাহলে এটি বাধ্যবাধকতা। (ইমামের তিলাওয়াত অবশ্যই শুনতে হবে।) নামায হবে, কিন্তু সেটি উন্নতমানের নামায হবে না। [মাকতুবাতে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৭, পত্র নম্বর-২০, প্রাপক মুনশী রুস্তম আলী সাহেব (রা.)]

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, মিয়া খায়রুদ্দীন শিখওয়ানী সাহেব লিখিত এক বিবৃতি আমাকে দিয়েছেন যে, একবার আমি হুযূরের কাছে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। (ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া সংক্রান্ত প্রশ্ন।) এতে তিনি (আ.) বলেন, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা উত্তম। আমি নিবেদন করলাম, যদি পড়া সম্ভব না হয়, তাহলে নামায হবে কি-না? তিনি বলেন, নামায তো হয়ে যায়, কিন্তু উত্তম হবে যদি ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা হয়। এটিও বলেন যে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা ছাড়া যদি নামায না হতো, তাহলে হানাফীদের যেসব বড় বড় পুণ্যাত্মা অতিবাহিত হয়েছেন, তারা কীভাবে পুণ্যাত্মা হলেন। (অনেক বুযুর্গ পাঠ করায় বিশ্বাসী ছিলেন না, তারা কীভাবে নেক হলেন?) তিনি বলেন, নামায উভয়ভাবে হয়ে যায়। আমি কেবল শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলছি। একইভাবে, মনে মনে আমীন বলাকে জোরে আমীন বলার উপর প্রাধান্য দেয়া যায়।" (সীরাতুল মাহ্দী, ২য় খণ্ড, চতুর্থাংশ, পৃ. ১৫৩, বর্ণনা নম্বর-১২১০)

পীর সিরাজুল হক সাহেব বর্ণনা করেন, মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব মরহুম একবার বলেন, শিয়ালকোটের আশপাশের কোন এক ব্যক্তি ছিল, প্রত্যেক দিন তাকে আমরা ইমামের পিছনে আলহামদুলিল্লাহ সূরা পড়তে বলতাম, আমরা নিজেদের জানা সকল যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করতাম, কিন্তু সে মানতো না। অর্থাৎ, ইমামের পিছনে সে আলহামদুলিল্লাহ সূরা পাঠ করত না, কিন্তু নামায আমাদের সাথেই পড়ত। একবার সে কাদিয়ানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হয়। একদিন এ ধরণের কথা চলতে থাকে। হুযূর (আ.) শুধু এটি বলেন যে, নামাযে ইমামের পিছনে 'আলহামদুলিল্লাহ' বা 'সূরা ফাতেহা' পাঠ করা উচিত। কুরআন শরীফ বা হাদীসের যুক্তি তিনি উপস্থাপন করেন নি, এতটা শুনে সেই ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা আরম্ভ করে আর উল্টা কোন যুক্তি দেয় নি।

এক ব্যক্তি [মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর] কাছে প্রশ্ন করে, যে ব্যক্তি নামাযে ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ করে না, তার নামায হয় কি-না? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এই প্রশ্ন করা উচিত নয় যে, নামায হয় কি-না। প্রশ্ন এটি হওয়া উচিত যে, নামাযে ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ করা উচিত কি-না? আমরা বলি যে, অবশ্যই পাঠ করা উচিত। নামায হবে কি হবে না, তা আল্লাহ্ তা'লাই জানেন। হানাফীরা পড়ে না অথচ হানাফীদের অনুসারী সহস্র সহস্র আলেম ছিলেন, তারা ইমামের পিছনে তা পড়ত না। যদি এদের নামায না হতো বা গৃহীত না হতো, তাহলে তারা ওলী আউলিয়া কীভাবে হলেন? তিনি বলেন, ইমামে আযম (ইমাম আবু হানীফার) সাথে আমাদের এক ধরণের সামাঞ্জস্য রয়েছে। ইমাম আবু হানীফার প্রতি আমরা গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল। আমরা এই ফতওয়া দিতে পারি না যে, নামায হয় না। সেই যুগে সব হাদীস সংকলিত হয় নি। যে রহস্য এখন উন্মোচিত হয়েছে, তা তখন উন্মোচিত ছিল না, তাই এটি তাদের সীমাবদ্ধতা ছিল। এখন এ বিষয়ের সমাধান হয়ে গেছে। এখন যদি পাঠ না করে, তাহলে তার নামায গ্রহণযোগ্যতার স্তরে পৌঁছবে না। এই প্রশ্নের উত্তরে বারবার আমরা এ কথাই বলব যে, ইমামের পিছনে নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা উচিত। একদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হুযূর! সূরা ফাতেহা কখন পাঠ করা উচিত? তিনি বলেন, যেখানেই সুযোগ লাভ হয়। আমি বললাম, ইমামের নিরবতার সময়ও কি পাঠ করা উচিত? তিনি বলেন, নামাযে যেখানেই হাতে সুযোগ আসে, সূরা ফাতেহা তেলাওয়াত করা উচিত।" (তাযকেরাতুল মাহ্দী, প্রথমাংশ, পৃ. ১৭৯-১৮০)

আমার মতে যারা পেশা স্বরূপ নামায পড়ায়, তাদের পিছনে নামায সঠিক হয় না। তাদের বেশির ভাগ খাবার এবং বেতনের জন্য নামায পড়ায়, তা না পেলে তারা সেই কাজ ছেড়ে দেয়। পবিত্র মন-মানসিকতা নিয়ে যদি জীবিকা অবলম্বন করে, তাহলে সেটি ইবাদত। মানুষ কোন কাজের সাথে যখন পূর্ণরূপে খাপ খাইয়ে নেয়, দৃঢ়-আস্থা অবলম্বন করে, তখন তা আর কষ্টদায়ক থাকে না, তা পালন করা সহজ হয়ে যায়।

নামাযের ধারাবাহিকতা বা ধারা বিন্যাস সম্পর্কে প্রশ্ন। অনেক সময় যোহর-আসর এবং মাগরিব-এশার নামায জমা হয়। যারা পরে এসে যোগ দেয় তারা বুঝতে পারে না যে কোন্ নামায হচ্ছে। এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, আমি স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে শুনেছি, ইমাম যদি আসরের নামাযে রত থাকেন আর এমন এক ব্যক্তি মসজিদে আসে, যে তখনো যোহরের নামায পড়ে নি বা মসজিদে যদি এশার নামায হয় আর এমন এক ব্যক্তি আসে, যার মাগরিবের নামায বাকী রয়েছে, তাহলে প্রথমে তার যোহরের নামায পড়ে ইমামের সাথে যোগ দেয়া উচিত অথবা মাগরিব নামায প্রথমে একা পড়ে ইমামের সাথে যোগ দিবে।

দুই নামায জমা করার ক্ষেত্রেও কোন ব্যক্তি যদি নামায চলাকালীন সময় মসজিদে আসে, তবে এ সম্পর্কেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ফতওয়া হল, সে যদি জানতে পারে যে, ইমাম আসরের নামায পড়াচ্ছেন, তাহলে তার উচিত প্রথমে যোহরের নামায পড়ে নেয়া, এরপর ইমামের সাথে যোগ দেয়া। একইভাবে, যদি সে জানতে পারে যে, ইমাম এশার নামায পড়াচ্ছেন, তাহলে প্রথমে সে মাগরিবের নামায পৃথকভাবে পড়বে, তারপর ইমামের সাথে যোগ দিবে। কিন্তু যদি তার জানা না থাকে বা জানতে না পারে যে, কোন্ নামায হচ্ছে– তাহলে সে জামা'তের সাথে যোগ দিবে। এমন পরিস্থিতিতে ইমামের নামাযই তার নিজের নামায বলে গণ্য হবে, পরে সে নিজের পূর্বের নামায পড়ে নিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি এশার নামায হয় আর মসজিদে এমন এক ব্যক্তি প্রবেশ করে, যে তখনো মাগরিবের নামায পড়ে নি, সে যদি জানতে পারে যে, এশার নামায হচ্ছে, তাহলে সে প্রথমে পৃথক মাগরিবের নামায পড়বে, তারপর ইমামের সাথে যোগ দিবে। কিন্তু যদি জানতে না পারে যে, কোন নামায হচ্ছে, তাহলে ইমামের সাথে নামায পড়বে। এমন পরিস্থিতিতে তার এশার নামায হয়ে যাবে, মাগরেবের নামায সে পরে পড়বে। একই কথা আসরের নামাযের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তখন জিজ্ঞেস করা হয় যে, আসরের নামাযের পর তো কোন নামায পড়া বৈধ নয়, নিজের জ্ঞান অনুসারে যদি সে আসরের নামাযে যোগ দেয়, তারপর আসরের নামায পড়া কীভাবে তার জন্য বৈধ হতে পারে? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এটি সঠিক যে, নিয়ম অনুসারে আসরের নামাযের পর কোন নামায বৈধ নয়। কিন্তু এর অর্থ এটি নয় যে, যদি দৈবক্রমে এমন কোন ঘটনা ঘটে যায়, তাহলেও সে আসরের সময় যোহরের নামায পড়তে পারবে না। এমনটি নয় যে, এমন পরিস্থিতিতে আসরের নামাযের পর যোহর নামায পড়া তার জন্য বৈধ হবে না। যদি পূর্বে জানতে পারে, তাহলে বৈধ নয় আর জানার সুযোগ না থাকলে পরে যোহর নামায পড়তে পারে। তিনি বলেন, স্বয়ং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আমি এটি শুনেছি। একবার নয়, দু'বার এটি শুনেছি। আমার মনে আছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দ্বিতীয়বার যখন সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, এতে তিনি বলেন, আমি এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা পূর্বেই দিয়েছি যে, নামাযের ধারাবাহিকতা বা ধারাবিন্যাস আবশ্যক, কিন্তু যদি জানতে না পারে যে, ইমাম কোন্ নামায পড়াচ্ছেন, আসর পড়াচ্ছেন, না-কি এশা, এমন ক্ষেত্রে ইমামের সাথে তার যোগ দেয়া উচিত। ইমামের নামাযই তার নামায গণ্য হবে, পরে সে নিজের পূর্বের নামায পড়ে নিবে।" (আল ফযল, ২৭ জুন ১৯৪৮, পৃ. ৩, ২য় খণ্ড, সংখ্যা ১৪৪)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এ রীতি ছিল যে, নামাযের পূর্বের ও পরের সুন্নত তিনি ঘরে পড়তেন। হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.) লিখেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শুরু থেকেই রীতি ছিল যে, তিনি সুন্নত এবং নফল ঘরেই পড়তেন। আর ফরয নামায জামা'তের সাথে মসজিদে পড়তেন। এই রীতিই তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল। অবশ্য যদি কোন সময় দেখতেন যে, ফরয নামাযের পর কিছু মানুষ যারা পরে নামাযে যোগ দিয়েছে, আর তখনো তারা নামায শেষ করে নি আর বের হওয়ার রাস্তা নেই, তাহলে মসজিদেই তিনি সুন্নত পড়তেন অথবা নামাযের পর কোন কোন সময় যখন মসজিদে বসতেন, তখন মসজিদেই সুন্নত পড়তেন। যেহেতু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এটি সাধারণ রীতি ছিল যে, কোন যুগে কিছু ছাত্র অদূরদর্শীতার কারণে ধরে নিয়েছিল যে, সুন্নত পড়া আবশ্যক নয়। [কেননা, তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নামাযের পূর্বে বা পরে কখনো সুন্নত পড়তে দেখে নি।] তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) কুরআন

ধৈর্য ধারণ কর আর অ-আহ্‌মদীদের পিছনে নামায পড়বে না। এতেই কল্যাণ ও পুণ্য নিহিত, এতেই তোমাদের সাহায্য এবং মহাবিজয় নিহিত আর এটিই এই জামা'তের উন্নতির কারণ। দেখ! দুনিয়াতে যারা মনোমালিন্য রাখে এবং পরস্পরের প্রতি অসন্তুষ্ট এমন ব্যক্তিরাও শত্রুর সাথে কথা বলে না। আর তোমাদের অসন্তুষ্টি ও কথা না বলা তো আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে। তোমরা যদি তাদের মাঝে মিলেমিশে থাক, তাহলে খোদা তা'লা তোমাদের উপর যে বিশেষ কৃপাদৃষ্টি রাখেন, তা রাখবেন না। পবিত্র জামা'ত যখন স্বকীয় অবস্থানে যায়, তখন তারা উন্নতি করে।

শরীফের দরসের সময় একবার বলেন, হযরত সাহেব [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)] এর রীতি ছিল, তিনি ফরয পড়ার পর তাৎক্ষণিকভাবে ঘরে চলে যেতেন আর আমিও প্রায় সময় এমনই করি, এর ফলে কিছু নির্বোধ ছেলের অভ্যাস হয়ে যায় যে, তারা ফরয নামাযের পর তাৎক্ষণিকভাবে মসজিদের বাহিরে চলে যায়। আমাদের ধারণা হল, তারা সুন্নত নামায পড়া থেকে বঞ্চিত থাকে। (এখনো আমি দেখেছি যে, কখনো কখনো এমনটি হয়), তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ভিতরে গিয়ে সর্বপ্রথম সুন্নত পড়তেন, আমিও তা-ই করি। কেউ কি আছে যে, [হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) জিজ্ঞেস করেন] হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই রীতি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারে যে, তিনি গিয়েই সুন্নত পড়তেন? তখন হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.), যিনি রীতি অনুসারে দরসেই উপস্থিত ছিলেন, তিনি দণ্ডায়মান হন এবং উচ্চস্বরে বলেন, এতে সন্দেহ নেই, হুযূরের স্থায়ী অভ্যাস ছিল যে, মসজিদে যাওয়ার পূর্বে তিনি ঘরে সুন্নত পড়তেন আর মসজিদে ফরয পড়ে ঘরে আসতেন আর তাৎক্ষণিকভাবে সুন্নত নামায পড়ার জন্য দণ্ডায়মান হতেন। সুন্নত নামায শেষ করে অন্য কোন কাজে হাত দিতেন। এরপর হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও একই সাক্ষ্য দেন। আর তারপর হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব, এরপর হযরত মীর ইসহাক সাহেব এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রবীণ সেবক হাফেজ হামীদ আলী সাহেবও চাক্ষুস সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেছেন।" [সীরাত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), রচয়িতা- হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.), পৃ. ৬৫-৬৭)

এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় যে, ইমামত পেশা হিসেবে অবলম্বন করা উচিত কি-না? কোন কোন জায়গায় কোন কোন মৌলভী অর্থের বিনিময়ে ইমামের চাকরী করে। তিনি (আ.) বলেন, "যে ইমাম পদের আকাঙ্ক্ষী থাকে,... তার পিছনে যদি নামায পড়া হয়, তাহলে সে নামায হওয়া সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। কেননা, প্রকাশ্যে প্রমাণিত হয় যে, তারা ইমামের পেশা অবলম্বন করছে, পাঁচ বেলায় গিয়ে এরা নামায পড়ে না, বরং এটি একটি দোকান, যা তারা নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে খোলে, তাদের এবং তাদের পরিবারের জীবন-জীবিকা এর উপরই নির্ভর করে। এই পেশা থেকে যদি কাউকে অপসারণ করা হয় বা সরিয়ে দেয়া হয়, তাহলে বিষয় গিয়ে আদালত পর্যন্ত গড়ায়। মৌলবী সাহেবরা নিজেদের ইমামতের পক্ষে ডিক্রি নেয়ার জন্য আপিলের পর আপিল করতে থাকে। তাই এটি ইমামত নয়, হারাম খাওয়ার একটা ঘৃণ্য রীতি।"(ফতেহ্ ইসলাম, রুহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬ টীকা) এ নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা করে যে, আমি এই জায়গার ইমাম হব আর তা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ চলতে থাকে আর এখনো এমনটি দেখা যায়।

পুনরায়, নামায পড়ানো যাদের পেশা, তাদের পিছনে নামায হয় কি-না? এ বিষয়ে তিনি (আ.) বলেন, "আমার মতে যারা পেশা স্বরূপ নামায পড়ায়, তাদের পিছনে নামায সঠিক হয় না। তাদের বেশির ভাগই রুটি-রুজির জন্য নামায পড়ায়, তা না পেলে তারা সেই কাজ ছেড়ে দেয়। পবিত্র মন-মানসিকতা নিয়ে যদি জীবিকা অবলম্বন করে, তাহলে সেটি ইবাদত। মানুষ কোন কাজের সাথে যখন পূর্ণরূপে খাপ খাইয়ে নেয়, দৃঢ়-আস্থা অবলম্বন করে, তখন তা আর কষ্টদায়ক থাকে না, তা পালন করা সহজ হয়ে যায়।" (আল বদর, ৯ জানুয়ারি ১৯০৩, পৃ. ৮৫, ১ম খণ্ড, সংখ্যা ১১)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে যারা কাফের আখ্যা দেয়, মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে যারা প্রত্যাখ্যান করে– তাদের পিছনে নামায পড়া সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, এদের পিছনে নামায পড়া হারাম। তিনি (আ.) বলেন, "যারা কাফের আখ্যা দেয় এবং মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করে, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। তাই আমার জামা'তের কোন ব্যক্তি তাদের পিছনে নামায পড়বে- তারা এর যোগ্য নয়। জীবিত কি মৃতের পিছনে নামায পড়তে পারে? স্মরণ রেখো! খোদা তা'লা যেভাবে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তোমাদেরকে কাফের আখ্যাদাতা বা তোমার সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী

কারো পিছনে নামায পড়া অবৈধ। তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য থেকেই হওয়া উচিত। এদিকেই বুখারীর একটি হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে যে, 'ইমামুকুম মিনকুম'।" (তোহফায়ে গোলড়াবিয়া, রূহানী খাযায়েন, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৬৪, টীকা)

অ-আহমদীদের পিছনে নামায অবৈধ হওয়ার কারণ কী? কেউ প্রশ্ন করে, যারা তাঁর (আ.) মুরীদ বা অনুসারী নয়, তাদের পিছনে নামায পড়তে ভক্তদেরকে কেন বারণ করেছেন? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যারা তড়িঘড়ি করে কু-ধারণা পোষণ করেছে আর সেই জামা'ত, যা আল্লাহ্ প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা প্রত্যাখ্যান করেছে আর অগণিত নিদর্শনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে নি এবং ইসলাম যে সমস্যার সম্মুখীন তার সম্পর্কে তারা ভ্রুক্ষেপহীন, এরা তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে নি। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পবিত্র গ্রন্থে বলেন যে, 'ইন্নামা ইয়াতাকাব্বালুল্লাহু মিনাল মুত্তাকীন' (সূরা মায়েদা: ২৮) অর্থাৎ, আল্লাহ্ শুধু মুত্তাকীদের নামাযই গ্রহণ করেন। তাই বলা হয়েছে, এমন ব্যক্তির পিছনে নামায পড়বে না, যার নামায গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদায় পৌঁছে না।" (আল হাকাম, ১৭ মার্চ ১৯০১, ৫ম খণ্ড, সংখ্যা ১০, পৃ. ৮)

দুই ব্যক্তি বয়আত করেন, এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে, অ-আহমদীদের পিছনে নামায পড়া বৈধ কি-না? তিনি (আ.) বলেন, "তারা আমাদেরকে কাফের আখ্যা দেয়, আমরা যদি কাফের না হই, তাহলে কুফরী তাদের উপরই বর্তায়। মুসলমানকে যে কাফের বলে, সে নিজেই কাফের হয়ে যায়। তাই এমন ব্যক্তির পিছনে নামায বৈধ নয়। আর তাদের মাঝে যারা নীরব, (কেউ কেউ বলে যে, এরা তো কিছু বলছে না, গালি দিচ্ছে না।) তারাও তাদেরই অন্তর্ভূক্ত, তাদের পিছনেও নামায পড়া বৈধ নয়। কেননা, তারা নিজেদের অন্তরে বিরোধী চিন্তাধারা পোষণ করে, বিরোধী ধ্যান-ধারণা পোষণ করে। তারা আমাদের সাথে যোগ দেয় না।" (আল বদর, ১৫ ডিসেম্বর ১৯০৫, পৃ. ২, ৪র্থ খণ্ড, সংখ্যা ৪৫) তারা আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলে না ঠিকই, কিন্তু অন্তরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রয়েছে। তাই তারা আমাদের সাথে যোগ দেয় না। এ কারণে তাদের পিছনেও নামায পড়া বৈধ নয়।

অ-আহমদীদের পিছনে নামায পড়ার বিষয়ে তিনি নিজ জামা'তের লোকদেরকে বলেন, "ধৈর্য ধারণ কর আর অ-আহমদীদের পিছনে নামায পড়বে না। এতেই কল্যাণ ও পুণ্য নিহিত, এতেই তোমাদের সাহায্য এবং মহাবিজয় নিহিত আর এটিই এই জামা'তের উন্নতির কারণ। দেখ! দুনিয়াতে যারা মনোমালিন্য রাখে এবং পরস্পরের প্রতি অসন্তুষ্ট এমন ব্যক্তিরাও শত্রুর সাথে কথা বলে না। আর তোমাদের অসন্তুষ্টি ও কথা না বলা তো আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে। তোমরা যদি তাদের মাঝে মিলেমিশে থাক, তাহলে খোদা তা'লা তোমাদের উপর যে বিশেষ কৃপাদৃষ্টি রাখেন, তা রাখবেন না। পবিত্র জামা'ত যখন স্বকীয় অবস্থানে যায়, তখন তারা উন্নতি করে।" (আল হাকাম, ১০ আগষ্ট ১৯০১, পৃ. ৩, ৫ম খণ্ড, সংখ্যা ২৯)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিশুদ্ধ চিত্তে এই জামা'তের সদস্য হওয়ার তৌফিক দিন, যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে চান।

শেষের দিকে আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্য দোয়ার অনুরোধ করতে চাই। এটি নতুন জামা'ত, তাদের অধিকাংশ নতুন বয়আতকারী বটে, কিন্তু তারা সুদৃঢ় ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইদানীং সরকারের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। বিনা কারণে তাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা করা হচ্ছে। তাদের অনেককেই কারাগারে পাঠানো হচ্ছে। অভিযোগ হল, 'নাউযুবিল্লাহ' তারাও দায়েসের মত। অথচ বর্তমানে কোন দেশে শান্তিপ্রিয় এবং দেশের আইন মান্যকারী যদি কেউ থেকে থাকে, তাহলে তারা জামা'তে আহমদীয়ারই সদস্য। কিন্তু এদের যেহেতু অপবাদ আরোপ করার ছিল, তাই তাদের সাথে আমাদের তুলনা করা হয়। পুলিশ অনেক সময় কোন কোন ঘরে ঢুকে মহিলাদের পর্দা খোলার হীন চেষ্টা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কয়েক দিন পূর্বে এক মহিলাকে বলে যে, তোমার ওড়না খুলে রাখ। তিনি বলেন, আমাকে হত্যা করতে পার, কিন্তু আমি ওড়না খুলব না আর না আহমদীয়াত ছাড়ব। জজরা বিচার-কার্যে অন্যায় করছে এবং এই ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এক জজ এক আহমদীকে বলে, আহমদীয়াত ত্যাগ কর, তাহলে এখনই তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি। এতে আহমদী উত্তর দেন, আমি মৃত্যু বরণ করব, কিন্তু আহমদীয়াত ছাড়ব না, ঈমান নষ্ট হতে দিব না। এটিই সঠিক ইসলাম, যা আমি এখন জানতে পেরেছি। জজ তাকে বলে, তুমি এই উত্তর দিয়েছ, তাই সারা জীবনের জন্য কারাগারেই পাঠাচ্ছি, সেখানেই তুমি মরবে। এতে আহমদী ভাই উত্তর দেন, তোমার যা ইচ্ছে তুমি তাই কর। কাজেই, বর্তমানে এই হল সেখানকার অবস্থা।

আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদের জন্য সেখানে সহজ-সাধ্যতা সৃষ্টি করে দিন, তাদেরকে দৃঢ়-চিত্ততা এবং অবিচলতা দান করুন আর বিরোধী ও আহমদীয়াতের শত্রুরা যা কিছু করছে, খোদা তাদের অনিষ্ট তাদের মুখেই ছুঁড়ে মারুন। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে এ সব নিপীড়নকারীদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ রাখুন।

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৭-২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, ২৪তম খণ্ড, সংখ্যা ৭, পৃ. ৫-৯)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

ঈদুল আযহার খুতবা

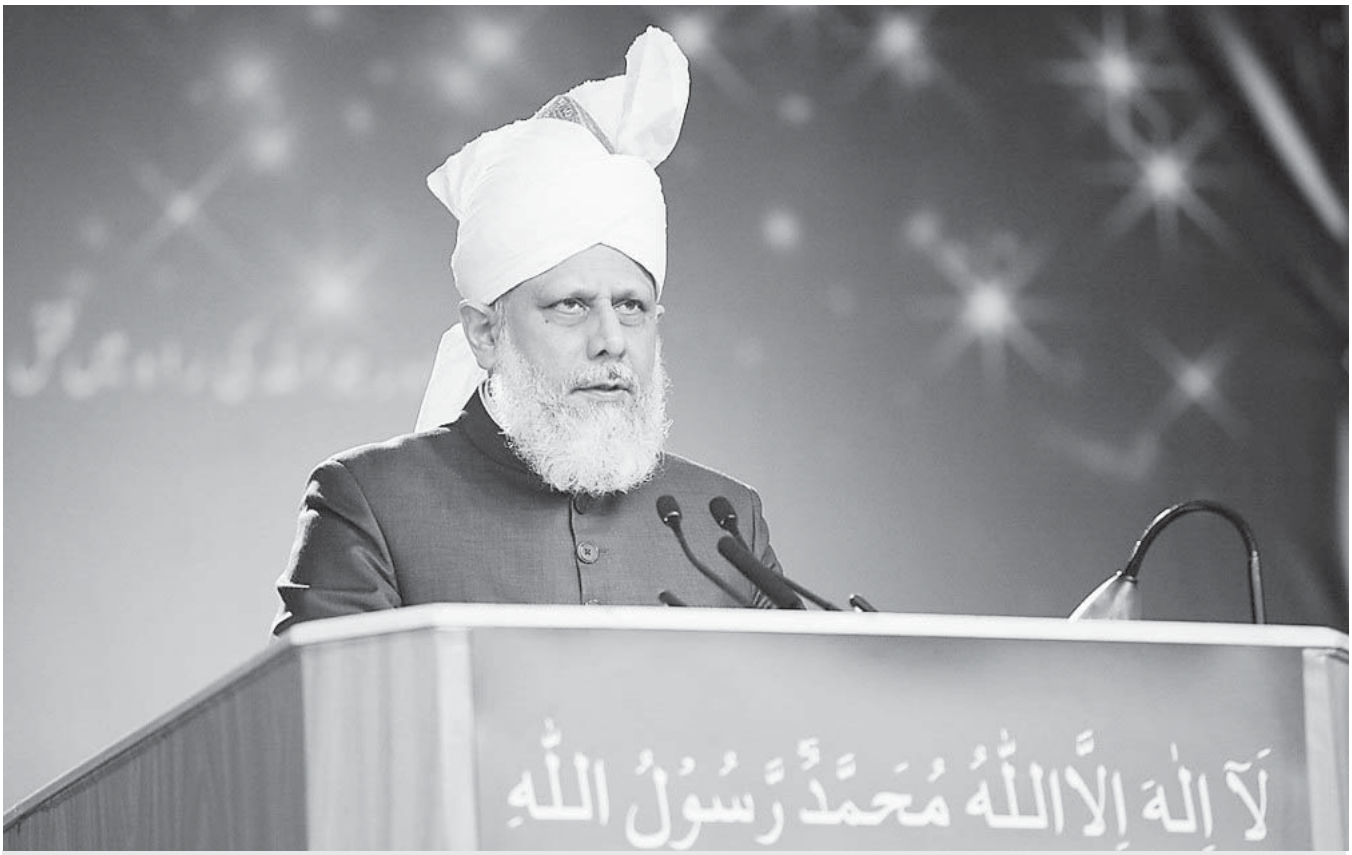

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত
১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ঈদুল আযহার খুতবা

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাউয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনওয়ার আইয়্যাদাহুল্লাহু তালা বলেন, কুরআন মজীদে আমরা একথা পড়ি এবং আমাদের বক্তৃতা ও খুতবায় বারবার উল্লেখও করা হয়। মনে হয় আমিও একথা বহুবার বলেছি যে, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেছেন, 'ওয়া মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়া'বুদুন'– জিন ও ইনসানকে কেবল মাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ- ইনসান বা মানুষ সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহ্ তা'লার পরিপূর্ণ দাসত্ব গ্রহণ করা। পরিপূর্ণ 'আবদ' বা দাস হওয়া। 'আবদ' বা দাস হওয়া বলতে কী বুঝায়? 'ইয়াবুদূনা'-এর অর্থ কি? এর অর্থ হলো, পরিপূর্ণ দাসত্ব এবং সমস্ত শক্তি ও সামর্থের সাথে সেবামূলক ইবাদতের হক বা অধিকার আদায় করা। অর্থাৎ এমন ইবাদত যা অন্তরের অন্তস্থল থেকে হবে, আন্তরিক ভালবাসার সাথে হবে, বোঝা হিসেবে আদায় করা হবে না। এমন আন্তরিক ভালবাসা যা কেবল খোদার জন্যই হবে অন্য কারো জন্য নয়, সাথে থাকবে পরিপূর্ণ আনুগত্য ও বিনয়। আমরা খোদা তালার অগণিত সৃষ্টি দেখে থাকি। আর আল্লাহ্ তা'লা এই সৃষ্টিগুলো বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করেছেন। সবাই নিজ নিজ গণ্ডিতে কাজ করে যাচ্ছে। অর্থাৎ সবাই খোদা তা'লার আনুগত্য করছে। সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মানুষ। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকেও বলেছেন, আমি তোমাদের উপর একটি কাজ অর্পন করেছি। সেই কাজটি কি? সেটি হলো, তোমার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে জানো, সেই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ কর যা তোমাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে, যে উদ্দেশ্যে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু কত জন মানুষ এই কথার

উপর আমল করে? দুনিয়ার অন্যদের কথা বাদই দিলাম, আমরা মুসলমানদের দিকে যদি তাকিয়ে দেখি, তবে এমন কত জন আছে যারা আল্লাহ্ তা'লার আদেশের উপর আমল করে পরিপূর্ণ আনুগত্যের সাথে, অন্তরের অন্তস্থল থেকে আল্লাহ্ তা'লার জন্য নিখাদ ভালবাসার প্রেরণা নিয়ে তাঁর ইবাদত করে? আমরা যদি পরিসংখ্যান নিই, তবে এমন সংখ্যা খুবই নগণ্যই। বরং অমনোযোগীতার সাথে অভ্যাসবশতঃ আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতকারীর সংখ্যাও অতি নগণ্য। অধিকাংশরাই নামায পড়ে না। এটি বড়ই অদ্ভূত বিষয় যে, অন্যান্য সৃষ্টবস্তু তার উপর অর্পিত কাজ সম্পাদন করে চলেছে, অবাধ্যতা করছে না। কিন্তু মানুষকে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, তোমাদের জীবনের একটি উদ্দেশ্য আছে যা খোদা তালা তোমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আর সেই উদ্দেশ্য তোমাদের সাধন করা উচিত। কিন্তু মানুষ তাঁর অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচারণ করছে তাদের উপর অর্থাৎ অন্যান্য সৃষ্ট জীব ও বস্তু অর্পিত কর্ম অনুগত্যের সাথে সম্পাদন করছে, কিন্তু মানুষের মাঝে সেই আনুগত্য নাই। এর কারণ কি? কারণ আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সৃষ্ট জীবের মাঝে কেবলমাত্র মানুষকেই ইচ্ছাধীন কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন। যদি তারা আল্লাহ্ তা'লার আদেশ অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করে স্বীয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুধাবন করে অর্থাৎ,- সেই উদ্দেশ্য হলো- পরিপূর্ণ বিনয়, নম্রতা, ভয়-ভীতি অবলম্বন করা, সকল প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা এবং নিজের সমস্ত সম্পর্ক কেবল খোদার জন্য উৎসর্গ করে দেয়া, মন্দ কর্ম ও আত্মম্ভরীতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে খোদা তালার সামনে অবনত হওয়া। এর ফলে খোদা তালাও মানুষের প্রতি ঝুঁকেন, তার দিকে অগ্রসর হন এবং তাকে নিজ প্রেম ও ভালবাসার চাদরে আবৃত করেন।

অর্থাৎ খোদা তালা মনুষ্যজাতি সৃষ্টি করে অবাধ্যতা ও আনুগত্য এই দুটি পথ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করে এটি বলেন যে, আমার আনুগত্য ও দাসত্বের পথ অবলম্বন করলে আমার পরিপূর্ণ বান্দা হয়ে আমার অফুরন্ত অনুগ্রহরাজীর অধিকারীও হবে আর এর মাঝে উত্তোরত্তর উন্নতি সাধন করতে থাকবে। পক্ষান্তরে, অন্যান্য সৃষ্টির কেবল একটিই পথ রয়েছে। এই পথে থেকেই তারা নিজ কর্ম সম্পাদন করে চলেছে। অনুগত্য ব্যতীত তাদের বিকল্প কোন পথ নাই। বিকল্প কোন পথই যখন নাই, তখন পুণ্য ও প্রতিদানের প্রশ্নও আসে না। তাদের মাঝে এই ক্ষমতা ও যোগ্যতা নাই যে, দুটি পথের মাঝে যে কোন একটিকে তারা বেছে নেবে।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা কেবলমাত্র মানুষের মাঝেই এই বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, তাদের দুটি পথ আছে যা তারা অবলম্বন করতে পারে। একটি হচ্ছে– স্বীয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করে খোদার ভালবাসা লাভের জন্য তাঁর খাতিরে বিনয় অবলম্বনের পথ। দ্বিতীয়টি হলো সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ না করে আল্লাহ্ তা'লার অবাধ্যতা করে তাঁর দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে শয়তানের দাসত্ব গ্রহণ করার পথ। এই পথ অবলম্বনের ফলে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার শাস্তিরও মুখাপেক্ষী হয়। সুতরাং আল্লাহ তা'লার আদেশাবলীর উপর আমল করে তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য করে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত 'আবেদ' বা ইবাদতকারী বান্দা হতে পারে, আর এই বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র মানুষকেই দেয়া হয়েছে। এমনকি ফেরেশতাদেরকেও এই মর্যাদা দেয়া হয় নাই। সুতরাং মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার এটি অনুগ্রহ যে, তিনি তাকে এমন এক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যা অর্জন করে সে খোদা তালার অত্যন্ত প্রিয়ভাজনদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে; বরং এমন স্থান ও মর্যাদায় পৌঁছতে পারে যেখানে ফেরেশতাও পৌঁছতে পারে না। অতএব মানুষ বড়ই ভাগ্যবান যে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে সৃষ্টি করে তাঁর অন্যান্য সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কিন্তু শর্ত হলো- আমি তোমাদেরকে যে শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতা দান করেছি এবং যে মস্তিষ্ক ও বিবেক দান করেছি, যা অন্য কোন সৃষ্টিকে দান করা হয় নাই, সেগুলো আমার ভালবাসা লাভের খাতিরে, আমার বাধ্যতা, আমার পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং আমার ইবাদতের খাতিরে ব্যয় করবে এবং নিজ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করবে, তবেই তোমরা আমার ভালবাসা লাভের অধিকারী হবে।

আমি যেমন বলেছি, মানুষকে আল্লাহ্ তা'লা এই অবকাশ দিয়েছেন যে, ভালো এবং মন্দ এই দুটি পথের মধ্যে যেকোন একটি পথ পছন্দ করতে হবে। মানুষকে মন্দ বা জাগতিক চাকচিক্য নিজের দিকে আকর্ষণ করে। কখনো কখনো এগুলো পরীক্ষা স্বরূপ সামনে এসে যায়। কখনো বা এমনও হয় যে, মানুষ পুণ্যের পথে হাঁটার সময় এমন কোন বস্তু সামনে এসে যায় যা তার পথভ্রষ্টতার কারণ হয়। বর্তমান যামানায় তো পদে পদে এমন বস্তু পাওয়া যায় যা পুণ্যের পথে পদচারণকারী একজনকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে বা আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। যদি মানুষ এগুলো থেকে বেঁচে চলে এবং স্বীয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন করে তবে আল্লাহ্ তা'লা যিনি নিজ বান্দাদেরকে অগণিত দানে ভূষিত করেন, তিনি জাগতিক মোহ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ব্যক্তির মর্যাদাও বৃদ্ধি করেন। তবে মানুষেরকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানানোর পর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাদের প্রতি সবচেয়ে বড় যে অনুগ্রহ করেছেন তা হলো- তিনি বান্দাদের প্রতি তাঁর আহ্বানকারী দূত প্রেরণ করেন, যারা বান্দাদেরকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করেন, মানুষদের মন্দ কর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেন এবং রক্ষা করতে চেষ্টা করেন, মানুষকে 'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল-সুদৃঢ় পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া থেকে রক্ষা করেন। তারা মানুষকে পুণ্য ও পাপের পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত করেন। এই শ্রেণীর লোকদের কথা আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজিদে দোয়া আকারে এভাবে বর্ণনা করেন, **'রাব্বানা ইন্নানা সামি'না মুনাদি আইইউনাদি লিল ইমানি আন আমিনু বিরাব্বিকুম ফাআমান্না; রাব্বানা ফাগফিরলানা যুনুবানা ওয়া কাফফির আন্না সায়্যিআতিনা ওয়া তাওয়াফফানা মায়াল আবরার।'** এর অর্থ হলো, হে আমাদের প্রভূ! নিশ্চয় আমরা একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি, যিনি ঈমানের দিকে ডাকছিলেন যে, নিজ প্রভূর প্রতি ঈমান আন। অতঃপর আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রভু! সুতরাং

আমাদের গুনাহ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দসমূহ দূর করে দাও এবং আমাদেরকে পুণ্যবানদের সাথে মৃত্যু দাও।

সুতরাং এই আহ্বানকারীরা হলো সেইসব লোক, যারা খোদা তালার পক্ষ থেকে এসে থাকেন এবং তারা মানুষকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করতে এসে থাকেন। মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের পথ প্রদর্শনের জন্য এসে থাকেন। অতএব, সৌভাগ্যের অধিকারী তারাই, যারা আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেয় এবং বলে, একজন আহ্বানকারীর আহ্বানে আমরা সাড়া দিয়েছি, যিনি খোদা তালার পক্ষ থেকে এসেছেন। এই আহ্বানকারী কোন্ ভাষায় এবং কোন দিকে আহ্বান করেছে? তিনি কি ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে ডাকছেন? পার্থিব লাভের দিকে ডাকছেন? তিনি কি অর্থ-সম্পদের দিকে ডাকছেন? না, বরং তিনি এমন এক আহ্বানকারী যিনি এই ঘোষণা দেন যে, হে লোক সকল! তোমরা গ্রহণ কর। কী গ্রহণ করব, কাকে গ্রহণ করব? তিনি বলেন, এটি ঘোষণা দাও যে, 'আমানু বিরাব্বেকুম'– স্বীয় প্রভূকে গ্রহণ কর। তাঁকে গ্রহণ কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে লালন-পালন করেছেন, দূর্বল অবস্থা থেকে তোমাদেরকে উন্নতির সকল ব্যবস্থা সরবরাহ করেছেন এবং তোমাদেরকে উচ্চ মর্যাদাও দান করেছেন। তাঁর আদেশাবলী গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হয়ে তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে স্বীয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে পূর্ণ কর।

সুতরাং সেই আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা বলি 'ফা আমান্না'- অতঃপর আমরা ঈমান এনছি আর সেই সাথে বিগলিত চিত্তে নিজ প্রভুর কাছে এই দোয়াও করছি, **'রাব্বানা ফাগফির লানা যুনুবানা'** অর্থাৎ,- হে আমাদের প্রভূ! আমাদের গুণাহ্ ক্ষমা কর। আমাদের ঈমান আনয়ন এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা তোমার বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া সম্ভব নয়। তোমার আদেশাবলী মেনে চলা, সেগুলোর উপর আমল করা তোমার কৃপা ও সাহায্য ছাড়া দুঃসাধ্য ও অসম্ভব বিষয়। তোমার সাহায্য না থাকলে এই ভারী বোঝা বহনের সামর্থ্য আমাদের নাই। আমরা তো সর্বদা ভুলত্রুটি করেই চলেছি। অগণিত ভুল-ত্রুটি করেছি। তোমার **'সাত্তার'** (গোপন রাখা) এবং **'গাফ্‌ফার'** (আবৃত রাখা) বৈশিষ্ট্য আমাদেরকে মন্দ পরিণাম থেকে বাঁচাতে পারে এবং বাঁচিয়ে চলেছে। তোমার দয়া, যা সবকিছুর উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী, তা সর্বদা আমাদের উপর আশিসমন্ডিত ছায়া প্রদান করে চলেছে। আমাদের মাঝে এই ক্ষমতা নাই যে, আমরা ভুলত্রুটি ও মন্দ থেকে নিজেকে রক্ষা করব। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রভু, পুণ্য করার শক্তি এবং এতে উন্নতি সাধন করা, ঈমানে দৃঢ় থাকা এবং তা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি করা তোমার অনুগ্রহ ছাড়া সম্ভব নয়। আমরা নিজ চেষ্টায় একাজ করতে পারব না এবং নিজেকে শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারব না।

সুতরাং কেবল তুমিই আছ, যিনি আমাদেরকে ঈমানের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং তা বৃদ্ধিও কর। সুতরাং আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করে দাও। এই দোয়া করা উচিত, হে আল্লাহ! আমাদের ঈমান বৃদ্ধি কর যেন আমাদের গুনাহসমূহ মাফ হয় এবং আমরা সেই লোকদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারি, যারা প্রকৃত ঈমান আনয়নকারী। 'ওয়া কাফ্‌ফির আন্না সাইয়্যাতিনা'– আমাদের থেকে আমাদের মন্দকর্মসমূহ দূর করে দাও। আমাদের মন্দকর্ম দূর হতে যত প্রকার প্রতিবন্ধক আছে, সব যেন দূর হয়ে যায়। বরং আমাদের মন্দকর্মসমূহ এমনভাবে মিটিয়ে দাও, যেন তা কখনই সংঘটিত হয় নাই। সকল শাস্তি থেকে আমাদেরকে বাঁচাও, যখন তোমার সমীপে উপস্থিত হবো। সেই লোকদের অন্তর্ভূক্ত কর যারা পুণ্যকর্মে অগ্রগামী, যাদেরকে তুমি এই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য এই দোয়া শিখিয়েছ, **'তাওয়াফ্‌ফানা মাআল আবরার'** অর্থাৎ,- আমাদেরকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত করে মৃত্যু দাও। এমন যেন না হয় যে, আমরা ঈমান তো এনেছি, কিন্তু পরবর্তীতে ঈমান থেকে দূরে সরে গেছি। যুগের সংশোধনের জন্য প্রত্যেক যুগে তিনি আহ্বানকারী প্রেরণ করেছেন। একবার তাকে গ্রহণ করার পর নিজ আমিত্বে জড়িয়ে নিয়ে মন গড়া সন্দেহে পতিত হয়ে ঈমানকে বিনষ্টকারী যেন না হয়ে যাই এবং আমাদের পরিণতি যেন মন্দ হয়ে না যায়। তাই, হে আমাদের খোদা! আমরা প্রার্থনা করছি, আমাদের পরিণাম যেন কখনও খারাপ না হয় এবং যখন আমাদের মৃত্যুর সময় আসবে, আমরা যেন ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি আর এমন লোকদের শামিল হই, যারা পুণ্যবান এবং পুণ্যকর্মে অগ্রগামী। আমাদের চালচলন, আমাদের বিবেক-বুদ্ধি, আমাদের জ্ঞান আমাদেরকে যেন সহজ সরল পথ থেকে দূরে সরিয়ে না দেয়।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আহ্বানকারীকে মান্য করার পর এই দোয়াও কর 'রাব্বানা ওয়া আতিনা মা ওয়াদ্‌তানা আলা রুসুলিকা ওয়ালা তুখযিনা ইয়াওমাল কিয়ামা; ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিয়াদ।' অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভূ-প্রতিপালক! সেই প্রতিশ্রুতি আমাদের জন্য পূর্ণ কর যা তুমি তোমার রসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে দিয়েছ আর আমাদেরকে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত করো না। নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করো না।

রসূলগণকে তোমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, সেই প্রতিশ্রুতি আমাদের জন্যও পূর্ণ কর। আমরাও যেন সেই সকল কল্যাণ থেকে কল্যাণমন্ডিত হই, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তোমার রসূলগণকে এবং আহ্বানকারীগণকে দিয়েছ। ওয়ালা তুখযিনা ইয়াওমাল কিয়ামা, অর্থাৎ- কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লাঞ্ছিত করো না, বরং আমাদের আমল এমন হোক যেন তোমার হুকুম-আহকামের অনুসরণ করতে পারি। শুধু বিশ্বাসগত কথাই যেন না হয়, বরং আমাদের কর্মও যেন তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের মানসম্পন্ন হয়। আমাদেরকে এমনভাবে তোমার আদেশাবলীর অনুসারী করে দাও যেন কিয়ামত পর্যন্ত আমরা সঠিক পথ থেকে দূরে সরে না যাই। আমরা যেন কোন শাস্তির মুখোমুখি না হই, যেন কোন শাস্তি আমাদের ওপর আপতিত না হয়। আমরা যেন তোমার সমীপে লজ্জিত অবস্থায় উপস্থিত না হই, আমাদের জীবনের

প্রতিটি মুহূর্ত যেন নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অতিবাহিত করি। আমরা যেন প্রকৃত ইবাদতের নমুনা প্রদর্শন করতে পারি এবং প্রকৃত ইবাদতকারী হই। আনুগত্য ও অনুগামীতাতেও আমরা যেন পিছু হটে না যাই। সুতরাং যেমনটি এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে, যার কিছুটা আমি বর্ণনা করছি, তা এই আওয়াজ যা আহ্বানকারী দিয়ে থাকে আর এই কথা যা সেই আহ্বানকারীকে গ্রহণকারী বলে থাকে। সুতরাং যখন এভাবে পরিচালিত হওয়ার যুগ হয়, তখন এটি সবচেয়ে বড় ঈদের দিন হয়ে থাকে। আমরা আহমদীরা সৌভাগবান যে এক হাজার বছরের অন্ধকার যুগের পর আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একজন আহ্বানকারীকে আমাদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন এবং তাকে গ্রহণ করার তৌফিক দিয়েছেন, আলহাদুলিল্লাহ্। তিনি আমাদেরকে বলেছেন যে, ইসলামের প্রকৃত সুন্দর চিত্র পৃথিবীবাসীকে দেখানোর জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেছেন, আঁ হযরত (সা.) এর নিষ্ঠাবান দাস হওয়ার কল্যাণে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) আনিত শরিয়তকে পৃথিবীতে পুণঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। আগমনকারী আমাদেরকে বলেছেন যে, আমাকে এজন্য প্রেরণ করা হয়েছে যেন মুনুষকে আল্লাহ্ তা'লার সঠিক বান্দা হওয়ার যেন পথ দেখাই, যা আল্লাহ্ তা'লার হুকুম আহকামের পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে লাভ হয়। তিনি (আ.) একস্থানে বলেছেন, "খোদা আমাকে এজন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন যেন আমি ধৈর্য, উত্তম চরিত্র এবং কোমলতার সাথে, হারিয়ে যাওয়া মানুষদেরকে খোদা এবং তার পবিত্র হেদায়াতের দিকে আকৃষ্ট করি এবং সেই নূর যা আমাকে দেওয়া হয়েছে তার আলোতে মানুষকে সত্য পথে পরিচালিত করি।" হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে সঠিক বান্দা হওয়ার জন্য কী উপদেশ দিয়েছেন? আমাদের কাছে তিনি কী চান? আমরা যখন **'আমান্না'** বলি, তখন আমাদের ব্যবহারিক জীবনের অবস্থা কীরূপ বানানো উচিৎ? জামা'তকে উদ্দেশ্য করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে উপদেশ দিয়েছেন তার মধ্য থেকে এক-দু'টি বর্ণনা করছি।

তিনি (আ.) বলেছেন, "আমাদের জামা'তের জন্য এটি জরুরী যে, তাদের ঈমান বৃদ্ধি হোক, খোদার ওপর প্রকৃত বিশ্বাস ও তাঁর বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান সৃষ্টি হোক, পুণ্যকাজে অলসতা ও উদাসীনতা দূর হোক। কেননা, অলসতা থাকলে ওযু করাকে একটি সমস্যা মনে হয়, তাহাজ্জুদ পড়া তো দূরের কথা। যদি পুণ্যকাজের শক্তি সৃষ্টি না হয়, নেককাজে প্রতিযোগিতার উদ্দীপনা সৃষ্টি না হয় এবং পুণ্যকাজে এগিয়ে যাওয়ার আবেগ সৃষ্টি না হয়, তাহলে আমাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা অনর্থক।" তিনি বলেন, "আনুগ্যত কোন ছোট বিষয় নয় এবং কোন সহজ কর্ম নয়। এটি এক মৃত্যুতুল্য। সঠিক অর্থে, আনুগত্য অবলম্বনে কোন জীবিত ব্যক্তির চামড়া উপড়ে ফেলার ন্যায় অবস্থা হয়ে থাকে।" এখন কুরবানীর ঈদ। আমরা পশু যবাই করি। তারপর পশুর চামড়া ছিলাই। সেসময়কালেও যদি কিছুটা প্রাণ অবশিষ্ট থাকে, তাহলে হয়ত সেটিরও কষ্ট হয়। কিন্তু তিনি (আ.) বলেছেন, আনুগত্য জীবিত ব্যক্তির চামড়া তুলে ফেলার মত হয়ে থাকে, যা এর চেয়েও বড় কুরবানী। তিনি (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে আনুগত্য করে না সে এই জামাতকে বদনাম করছে।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, "বয়আত গ্রহণ করে কোন ব্যক্তির শুধু এটিই মানা যথেষ্ট নয় যে, এই জামাত সত্য আর এতটুকু মানলেই তার কল্যাণ হবে। শুধু মান্য করলেই আল্লাহ্ তা'লা খুশী হন না, যতক্ষণ পর্যন্ত উত্তম কর্ম না হবে। চেষ্টা কর, যখন এই জামাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছ, পুণ্যবান হও, মুত্তাকী হও, প্রত্যেক প্রকার মন্দকাজ থেকে বেঁচে চল। বিনয়ের সাথে দোয়া, সদকাহ্-খয়রাত কর, কোমলতার সাথে কথা-বার্তা বল, ইস্তেগফারকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত কর, নামাযে দোয়া কর।" তিনি (আ.) বলেন, "নামায ও ইস্তেগফার হৃদয়ের উদাসীনতার উৎকৃষ্ট চিকিৎসা। নামাযে এ দোয়া করা উচিত যে, হে আল্লাহ্! আমার ও আমার পাপসমূহের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি কর। সত্য-হৃদয়ে মানুষ দোয়া করলে এটি নিশ্চিত যে, কোন এক সময় কবুল করা হবে। তিনি বলেন, নামায এমন একটি পুণ্য যা আদায় করার মাধ্যমে শয়তানী দুর্বলতা দূর হয় এবং এর নাম হলো দোয়া। শয়তান চায়, মানুষ যেন এতে দুর্বলতা দেখায়। কেননা, সে জানে যে, নিজের সংশোধন মানুষ যতটুকু করবে, তা এর মাধ্যমেই করবে।" অর্থাৎ নামাযের মাধ্যমে সংশোধন হবে। সুতরাং সেই বিপুল ধন-ভাণ্ডার, যা যামানার ইমাম ও আহ্বানকারী আমাদেরকে দিয়েছেন তা থেকে এই কয়েকটি কথা যা আমি আপনাদের সামনে রেখেছি। এক ঈদ তখন ছিল, যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ প্রেরণ করেছেন। সেই সময় পৃথিবী অস্থির ছিল। ধর্মের জন্য ব্যথাতুর ব্যক্তি দুশ্চিন্তগ্রস্থ ছিলেন। মুসলমানগণ ঈদ পালন করতেন। কিন্তু সেই ঈদগুলোতেও যে ব্যক্তি ইসলামের প্রতি ভালবাসা রাখত, সে অস্থির ছিল এবং কোন মসীহ্‌র আগমনের অপেক্ষায় ছিল, যেন তিনি আসেন এবং ধর্মের রোগীদেরকে আরোগ্য দান করেন এবং তারা ঈদের প্রকৃত খুশি উদযাপন করতে পারে। আমাদের ইতিহাসে এক বুযুর্গ ব্যক্তি মুন্সি আহমদ জান সাহেবের উদ্ধৃতির মাধ্যমে এই বিষয়টি প্রকাশ পায়, যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখতেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর তাকওয়া, ইবাদত এবং মর্যাদা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তার (আ.) দাবীর পূর্বেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে তিনি নিজের অন্তরের আবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেন–

হাম মারীযো কী হ্যায় তুমহি পে নযর
তুম মাসীহা বানো খুদা কে লিয়ে

(আমাদের মত রুগ্নরা তোমার পানে চেয়ে আছে
তুমি খোদার খাতিরে মসীহ্ হয়ে যাও।)

যেন আমরা প্রকৃত ঈদ পালন করতে পারি। সেই বুযুর্গ, অর্থাৎ- মুন্সি আহমদ জান সাহেবের মৃত্যু তো তাঁর (আ.) বয়আত নেয়ার পূর্বেই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যারা সেই যুগে এবং পরবর্তীতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে

বয়আত নিয়েছিলেন, প্রকৃত ঈদের আনন্দ তো তখন তাদের হয়েছিল। নিশ্চয় ঈদ তো তারই হতে পারে, যে সুস্থও আছে এবং নিজের প্রিয় মানুষের কাছে খুশিতে রয়েছে। সুতরাং আধ্যাত্মিক রোগীদের চিকিৎসার জন্য, ইসলামের দোদুল্যমান তরী সামলানোর জন্য আল্লাহ্ তা'লা যখন মসীহ্‌কে প্রেরণ করেছেন, তখন তিনি শত শত মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবে আরোগ্য দান করেছেন। জামাতের ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনাবলী সংরক্ষিত আছে, বরং এখনও এমন হচ্ছে, যার কতিপয় ঘটনা আমিও সময়ে সময়ে বিভিন্ন সুযোগে বর্ণনা করে থাকি।

অনেক লোক লিখেন, সত্যকে পেয়ে আমরা প্রশান্তি ও স্বস্তি লাভ করেছি। আর হৃদয়ের প্রশান্তি ও স্বস্তিই তো প্রকৃত ঈদ। কেননা, আজ আমরা প্রত্যেকে যতটা আনন্দিত, এর পূর্বে কখনও ততটা হইনি। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) একবার এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে এই উদাহরণ দেন যে, "দেখ! কোন বৈঠকে অনেক মানুষ একত্রিত হয়। যদি কারো বাচ্চা হারিয়ে যায় এবং দুই-এক ঘন্টা পর যখন সেই বাচ্চা তার বাবাকে খুঁজে পায়, তখন সন্তান ও পিতা কতটা খুশি হয়! এরূপই খোদা থেকে দুরে সরে যাওয়া বান্দা যখন খোদা তা'লার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং খোদার নিকট পৌঁছায়, তখন বান্দাও অনেক আনন্দিত হয় এবং খোদাও সন্তুষ্ট হন। তিনি (রা.) আরো বলেন, প্রকৃত ঈদ যদি হয়, তবে এটাই। আর এই ঈদ তো সেই ঈদগুলোর পানে ইঙ্গিত করে যা আমাদের ঈদ। বাহ্যত এই ঈদ প্রকৃত ঈদগুলোর পথনির্দেশক। ঈদ ঘরে ও নিজ-ভূমে অনেক ভালো লাগে। মানুষ ঘরের বাইরে থাকলে তাদের ঈদগুলো অত্যন্ত সীমিত হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি যদি জঙ্গলে থাকে আর চার দিকে হিংস্র প্রাণি থাকে, ডাকাত থাকে, যদি প্রাণ হুমকিতে থাকে, তখন ঈদের কী-বা আনন্দ! ঈদ তো তারই, যে নিজ আবাসগৃহে থাকে, নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে ও নিজের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ঈদ পালন করে, বন্ধুদের সাথে থাকে, বিপদ-আপদ থেকে সুরক্ষিত থাকে, তারই তো ঈদ হতে পারে।

যে ব্যক্তি খোদার রাস্তা থেকে দূরে সরে রয়েছে, পথভ্রষ্টতা ও অন্ধকারের জঙ্গলে হাতাশাগ্রস্ত হয়ে ঘুরে ফিরছে, তার প্রকৃত-ঈদ কি হতে পারে? ঈদ তো আনন্দের নাম এবং আনন্দ হৃদয়ের প্রশান্তি, হৃদয়ের স্বস্তি থেকে সৃষ্টি হয়। সকল ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দু তো খোদা তা'লা এবং একজন প্রকৃত মু'মিনের উচিত, খোদার সাথে ভালবাসার সম্পর্ক রাখা । অতএব আনন্দ সেই পাবে এবং প্রকৃত ঈদও সেই পাবে, যে নিজের প্রভুর নিকট পৌঁছায়। কেননা, সমস্ত প্রকারের প্রশান্তি, আনন্দ, ঈদের উৎপত্তিস্থল তো সেই পবিত্র-সত্তাই।"

অতএব এটাই সত্য আর এটিকে আমাদের আপন করার চেষ্টা করা উচিত। যদি প্রকৃত ঈদ আমরা উদযাপন করতে চাই, তবে আমাদের চেষ্টা করা উচিত নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থার চিকিৎসা করা, নিজেকে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখা। আমি পূর্বেও বলেছি যে, আল্লাহ্ তা'লাই শয়তান থেকে রক্ষাকারী এবং সঠিক পথে পরিচালনাকারী, তাই তাঁর কাছে দোয়া করা উচিত। যুগের ইমামকে মেনেছি, তাই তাঁর (আ.) কথার ওপর আমল করা আবশ্যক, যাতে আমরা নিজেকে খোদার সাথে সম্পৃক্ত করতে পারি এবং এইভাবে নিজের সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য তা পূর্ণকারী হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

খুতবায়ে সানিয়ার পর দোয়া হবে, দোয়াতে বিশেষ করে সেসকল লোকদেরকে স্মরণ রাখবেন, যারা মুসলিম উম্মতের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ভ্রষ্টতা এবং অন্ধকারে নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদের হেদায়াত দিন, পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হওয়ার কারণে একে অপরের ওপর অত্যাচার করছে, রাষ্ট্রের বড় বড় কর্মকর্তারা সাধারণ জনগণের ওপর অত্যাচার করছে আর স্বার্থপর, নামধারী ধর্মীয়-নেতারা সর্বসাধারণের আবেগকে অবৈধভাবে জাগিয়ে অত্যাচার করাচ্ছে এবং তাদের নিজেদের ওপরও অত্যাচার করাচ্ছে। সাধারণ জনগণ দুই দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তাই, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এই অত্যাচার থেকে বাঁচান, এইসব পথভ্রষ্টতা থেকে, এইসব অন্ধকার থেকে বের করুন। এই সমস্ত মানুষ, যারা নিজেদের ঈদের আনন্দকে ধ্বংস করছে আর অন্যদের ঈদের আনন্দও ধ্বংস করছে এবং খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত আহ্বানকারীর আওয়াজ না শুনে খোদার অসন্তুষ্টির পাত্র হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এই সমস্ত মানুষদের বুদ্ধি-বিবেক দিন যাতে তারা সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে।

আসীরানে রাহে মাওলারাও বন্দী জীবন যাপন করছেন, তাদের জন্যও দোয়া করুন। কেননা, তারা কোন কারণ ছাড়াই শত্রুতার জেরে বন্দী-জীবন অতিবাহিত করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের মুক্তির পথ উন্মোচিত করুন। সেসব আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন যাদের কেবল আহমদী হওয়ার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কষ্ট দেয়া হচ্ছে, অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা যেন অসুস্থদের পরিপূর্ণ আরোগ্য দান করেন। কল্যাণকামী অনেক মানুষ আছেন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে মানবতার সেবা করার তৌফিক আরো বেশি মাত্রায় দান করেন। পৃথিবীর সার্বজনীন অস্থিরতা দূর হওয়ার জন্যও দোয়া করুন। বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন বিপদে আক্রান্ত লোকদের জন্য দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা যেন সবার বিপদাপদ দূর করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ওয়াকফে জিন্দেগীরা ধর্মের সেবা করছেন, তাদের সবার জন্য দোয়া করুন।

এরপর হুযুর (আই.) খুতবা সানীয় পাঠ করেন। তারপর দোয়া পরিচালনা করেন। তারপর বলেন, আপনাদের সবাইকে 'ঈদ মোবারক'। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী সকল আহমদীকে ঈদ মোবারক। তারপর তিনি 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু' বলে বিদায় নেন।

অনুবাদ: **রশিদ আহমদ, মুরব্বি সিলসিলাহ,**
শিক্ষক জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

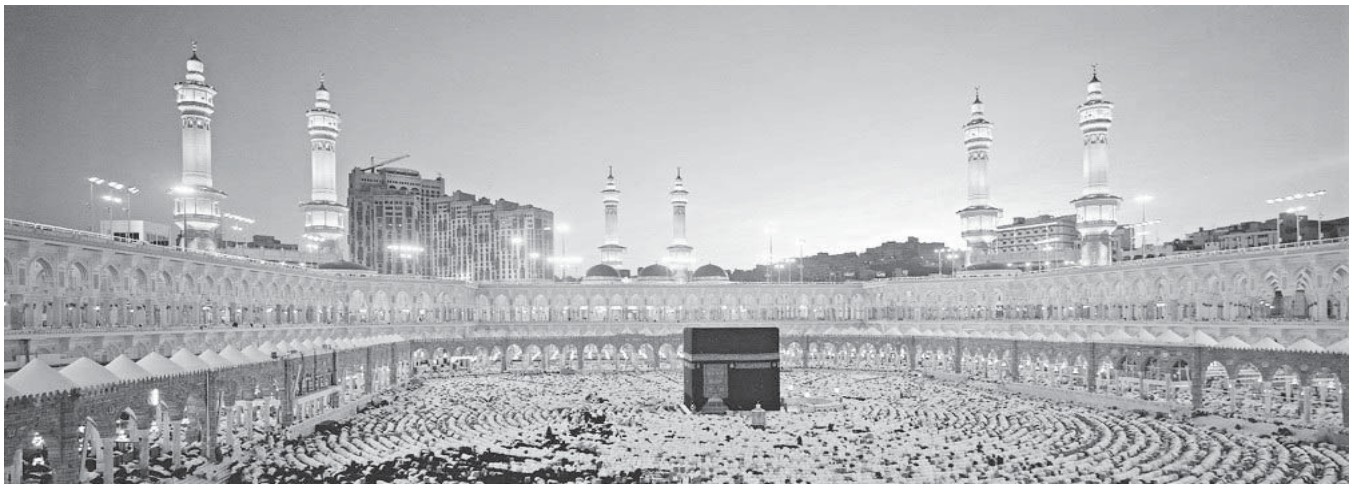

ঈদ-উল-আয্‌হিয়ার কুরবানী আল্লাহ তা'লার নৈকট্যলাভের উৎকৃষ্ট বাহন

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্‌

পবিত্র কুরআনে কুরবানী সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনা

কুরবানীর নিয়মপদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়া প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত শিক্ষামালায় যে আদর্শিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আল্লাহ তা'লা আমাদের শিখিয়েছেন, তা হল-

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ ؕ فَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗ أَسْلِمُوْا ؕ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۝٣٥ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣٦ وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝٣٧

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٣٨

(আল হাজ্জ: ৩৫-৩৮)

অর্থাৎ- আর আমরা প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানীর একটা নিয়মপদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি যেন তারা সেইসব গবাদি পশুর উপর আল্লাহর নাম নেয় যেগুলো তিনি তাদের দান করেছেন। অতএব তোমাদের উপাস্য একজনই। সুতরাং তোমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর। আর তুমি সুসংবাদ দাও বিনয় অবলম্বনকারীদের, যাদের হৃদয় (সশ্রদ্ধ) ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে যখন (তাদের সামনে) আল্লাহর নাম নেয়া হয় এবং যারা দুঃখকষ্টে পড়লে ধৈর্য ধরে, নামায কায়েম করে এবং যা-ই আমরা তাদের দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।

আর যেসব কুরবানীর উটকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ-নির্ধারিত পবিত্রতার প্রতীকসমূহের অন্তর্গত করে দিয়েছি তোমাদের জন্য সেগুলোতে কল্যাণ রয়েছে। অতএব সারিতে দাঁড় করিয়ে সেগুলোর উপর আল্লাহর নাম নাও। আর (জবাই করার পর) সেগুলো যখন (মাটিতে ঢলে পড়ে তখন তা থেকে খাও, স্বল্পে তুষ্ট (অভাবী)দেরও খাওয়াও এবং সাহায্যপ্রার্থীদেরও (খাওয়াও)।

এগুলোর মাংস ও এগুলোর রক্ত কখনো আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, বরং তাঁর কাছে তোমাদের তাকওয়া পৌঁছে। এভাবেই তিনি এগুলোকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন যেন তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, কারণ তিনি তোমাদের হেদায়াত দান করেছেন। আর তুমি সৎকর্মপরায়ণদের সুসংবাদ দাও। (আল হাজ্জ : ৩৫-৩৮)

কুরবানী অবিরাম সৎকর্ম করার শিক্ষা দেয়

স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অবিরাম সৎকর্ম করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তা'লার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কুরবানী করা হয়ে থাকে। কুরবানীর বিষয়বস্তুতে ত্যাগের এই পদ্ধতি বা নিয়ম-প্রণালীই, উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা সূচিত হয়েছে। কুরবানী সম্বন্ধে

আদেশ কেবল ইসলামেই সীমাবদ্ধ নয়,বরং এ আদেশ সকল ধর্মে সার্বজনীন। কারণ একই অভিন্ন ঐশী সূত্র থেকে তা উদ্ভুত। পবিত্র আয়াতমূলে এ এক প্রামাণিক সত্য যে, আদিকাল থেকেই সকল ধর্মের অনুসারীদের উপর যা নির্দেশ করা হয়েছিল, তা ছিল পশুরই কুরবানী। মানব-সন্তান বলি দেয়ার নিষ্ঠুর যে প্রথা, তা পরবর্তী কালের প্রক্ষেপনমুলক প্রবর্তন।

প্রকৃত ও অকৃত্রিম কুরবানীর জন্য কুরআনে উল্লেখিত মূল শব্দ 'নাসাকা'-তে তিন প্রকার বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যের সমাহার রয়েছে (লেইন): (ক) এটি স্বেচ্ছাকৃত এবং স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া উচিত, (খ) এই কুরবানী পবিত্রতম উদ্দেশ্যে হতে হবে এবং (গ) এতে পার্থিব বিবেচনাপ্রসূত কোন উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত থাকা চলবে না।

কুরবানীর শিক্ষা : এক ও অভিন্ন অস্তিত্ববান মহান সত্তার অকাট্য এক দলীল

এ থেকে সাব্যস্ত হয় : (১) কুরবানীর নিয়মপ্রণালী সর্ব ধর্মে সার্বজনীন, যদিও আপন আপন উৎপত্তির স্থান ও কালের দিক থেকে তা একে অপর থেকে বহুবিধ ব্যবধানে পৃথক ও স্বতন্ত্র। কিন্তু বাস্তব এই ঘটনা প্রমাণ করে, আদিতে তারা সকলেই একই সর্বোচ্চ উৎস থেকে উদ্ভুত এবং সকল জাতির খোদা এক ও অভিন্ন সত্তা, (২) কুরবানীর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের উচ্চাভিলাস, আমাদের সর্বপ্রকার ধারণা, কল্পিত আদর্শ এমনকি প্রাণ ও সম্মান আল্লাহ তা'লার জন্য ত্যাগ করে তাঁর তৌহীদ অর্থাৎ একত্ব উপলব্ধি করা এবং তা ঘোষণা করা। ইসলাম ধর্মে কুরবানীর ধারণা ক্রুদ্ধ বা ক্ষুব্ধ কোন দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করা নয় অথবা কারো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাও নয় বরং এই কুরবানী আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর পথে ব্যক্তির সমস্ত কিছুই নিবেদন করা হল উদ্দেশ্য।

কুরবানীর জন্য মক্কায় সমবেত হাজীগণের উটগুলোকে যবাই করা এরূপ এক প্রতীক যে, মানুষ তার স্রষ্টা এবং প্রভুর পথে সেভাবেই জীবন দিতে প্রস্তুত, যেমন করে উটগুলো তাদের নিজ মালিকের জন্য প্রাণ দেয়। এটাই কুরবানীর চরম উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। আয়াতে উল্লিখিত অপর উদ্দেশ্যসমূহ দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। যখন একটি পশুকে কুরবানী করা হয় তখন তা হজ্জযাত্রীকে স্মরণ করিয়ে দেয়, এ হচ্ছে আল্লাহর এক নিদর্শনস্বরূপ। কুরবানীর এই আয়াতসমূহ আরো প্রমাণ করে, কুরবানীকৃত পশুর গোশত্ সঠিকভাবে বণ্টন করা উচিত যেন অপচয় না হয়।

এটি সর্বোচ্চ এই শিক্ষাও প্রদান করে যে, কুরবানীর বাহ্যিক ক্রিয়া-কলাপ আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করে না বরং এই আনুষ্ঠানিকতার মর্মে যে তাক্বওয়া, প্রেরণা ও অন্তর্নিহিত শক্তি, তাই তাঁকে খুশী করে। কুরবানীকৃত পশুর মাংস এবং রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছে না, অন্তরের তাকওয়াই কেবল তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য। কুরবানীকারীর আপন ও প্রিয় যা কিছু আছে, আল্লাহ তা'লা তার কাছ থেকে সর্বপ্রকারের কুরবানী তলব করেন এবং গ্রহণ করে থাকেন-আমাদের পার্থিব সহায়-সম্পদ, প্রিয় ভাবাদর্শ, আমাদের সম্মান, এমনকি নিজ জীবন পর্যন্ত। বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ তা'লা পশুর রক্ত ও মাংস আমাদের নিকট চান না এবং আশাও করেন না। বরং তিনি আমাদের আত্মোৎসর্গ প্রত্যক্ষ করে থাকেন। তবে এটা মনে করা ভুল হবে, বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতার অন্তরালে সক্রিয় মনোভাবই যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ, সেজন্য দৃশ্যতঃ কর্মানুষ্ঠান বুঝি মূল্যহীন! মোটেই তা নয়, কুরবানীর প্রকৃত তত্ত্ব, বাহ্যিক ক্রিয়া খোসাস্বরূপ আর এর অভ্যন্তরীণ প্রেরণা তার শাঁস। অনুরূপভাবে, কোন বস্তুর দেহাবরণ তার শাঁস বা সারাংশের মতই অতি জরুরী। কারণ আত্মা যেমন দেহ ছাড়া থাকে না তেমনই কোন শাঁসও খোসা ছাড়া থাকতে পারে না।

কুরবানীর মর্ম ও দর্শন

"এই তত্ত্বকথার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত যে,কুরবানী একান্তভাবেই আল্লাহ তা'লার জন্য এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত-খোদা তা'লা তোমাদের অভ্যন্তরে তাকওয়া প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তোমাদের থেকে কুরবানী চান।

এই গোস্ত আর রক্ত যা তোমরা পশু যবাই করে পেয়ে থাক, তোমাদের এই রক্ত বইয়ে দেয়াটা তাকওয়াশুণ্য হয়ে থাকলে, আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকলে, আল্লাহ তা'লার তো বস্তুজগতের ঐসবকিছুর সাথে কোনই সম্পর্ক নাই। আল্লাহ তা'লা তো এই বাহ্যিক কুরবানী করার মধ্য দিয়ে কুরবানীর অন্তর্নিহিত মর্ম ও প্রেরণা তোমাদের মাঝে সৃষ্টি করতে চান। তোমরা যখন পশু যবাই কর তখন তোমাদের বোধোদয় হয় যে, আল্লাহ তা'লা তাঁর এক নির্দেশ কার্যকর করানোর উদ্দেশ্যে এই পশুকে আমার কর্তৃত্বাধীনে দিয়েছেন আর আমি এর গলায় অনায়াসে ছুরি চালিয়েছি। আল্লাহ তা'লা আমাকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সুন্নতের ওপর আমল করার সৌভাগ্য দান করেছেন। আল্লাহ তা'লা আমাকে মহানবী (সা,)এর সুন্নতের অনুসরণে পশু যবাই করার তৌফিক দিয়েছেন। আল্লাহ তা'লা আমাকে সৌভাগ্য দান করেছেন যে, আমি তাঁর নির্দেশ পালনকারী হতে পেরেছি, এতটুকু যোগ্য হতে পেরেছি যে তাঁর নির্দেশ পালনে সক্ষম হয়েছি। তিনি আমাকে সৌভাগ্য দান করেছেন যে, আমি তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে প্রচেষ্টাকারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়েছি।

অতএব, আল্লাহ তা'লা আশ্বাস দিয়ে বলেন, এই নিয়্যতের সাথে কুরবানী করে থাকলে,তাকওয়ার পথে পদচারনার সাথে কুরবানী করে থাকলে, সেই কুরবানী আমার সন্নিকটে পৌঁছুবে-এই হল কুরবানীর মর্ম, যা অবলম্বন করে আল্লাহ তা'লার সমীপে কুরবানীসমূহ নিবেদন করা উচিত।" (হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) প্রদত্ত খুতবা ঈদ-উল-আযহিয়া, ২১ জানুয়ারী- ২০০৫)

আল্লাহ তা'লার সমীপে সকরুন আবেদন-নিবেদন, তিনি নিজ অনুগ্রহ ও অনুকম্পায় আমাদের নগন্য কুরবানী গ্রহণ করে আমাদেরকে স্বীয় কৃপার চাদরে আচ্ছাদিত করে নিন, আমীন!

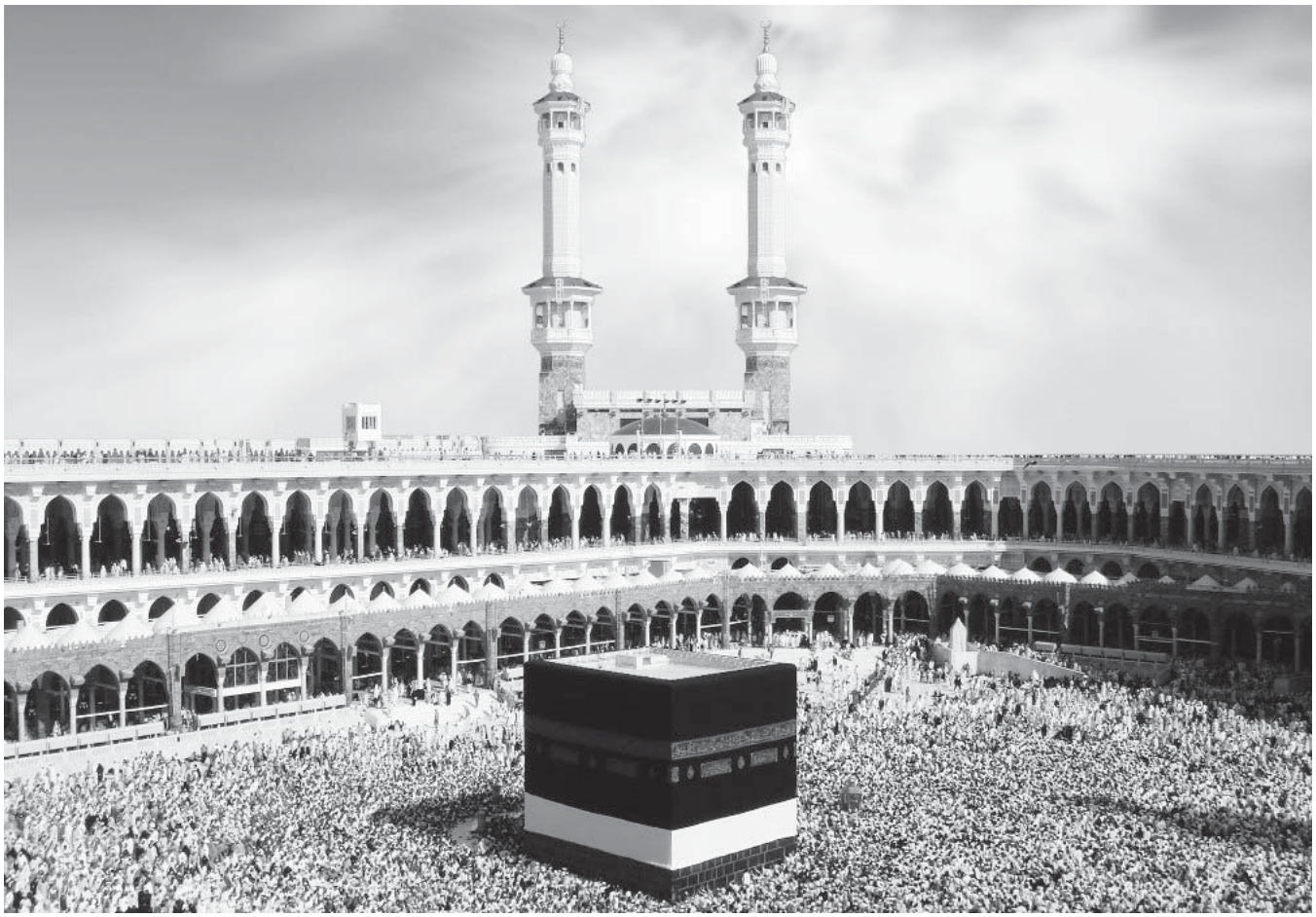

ইসলামের জীবন বাঁচাতে এখন ইসমায়িলী কুরবানী প্রয়োজন

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

ইসলামের এখন বড়ই দুর্দিন। তার জীবনের ওপর অন্যসব ধর্মের অনুসারীদের ক্রোধের প্রচন্ড আক্রমণ। তাকে পরাস্ত-পরাহত করতেই হবে। আল্লাহ্ প্রদত্ত তার পরমোৎকৃষ্টতায় অপবাদ এনে তাকে লাঞ্ছিত করতে হবে, এতোদ্দেশ্যেই তার ওপর দুর্বৃত্তগণের এই চরম আক্রমণ। এই আক্রমণের কতক হচ্ছে প্রত্যক্ষ আর কতক হচ্ছে পরোক্ষভাবে। এসব অপকর্ম কখনো সাধিত হচ্ছে মুসলিম নামধারী বিকৃত-মস্তিস্কের মানব-সন্তানের হীন-অপচেষ্টায়। আর তারা এ ধরনের হীন কাজে মদদ ও অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বিধর্মীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্ররোচনায়। তাদের মগজ মস্তিষ্কে এ ধারণার বীজ বপন করে দেয়া হয়েছে যে, অস্ত্রের ক্ষমতা বলে রক্তের প্লাবন বইয়েই কেবল সম্ভব ইসলামের বিজয় সাধন। এ কুৎসিত ধারণাকে সম্বল করে ইসলামের অজ্ঞ-উগ্র একদল অনুসারী মারাত্মক সব মারণাস্ত্র ব্যবহারে মুসলমানদেরই প্রাণ সংহার করছে কাতারে-কাতার। শিশুদের করছে পিতৃহীন আর পিতামাতাকে করছে সন্তান হারা। অনেকের ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করা হচ্ছে। প্রাণের মমতায় প্রাণ বাঁচাতে এদের কেউ কেউ ডিঙ্গিতে করেই মহাসাগর পাড়ি দেয়ার দুঃসাহস করছে। হায়! এদের অনেকেরই প্রাণ বাঁচানোর সেই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা সফল হয় নি, ফলে মহাসাগরের অতল জলে তাদের অনেকেরই সলিল-সমাধি হয়েছে। এমনসব ঘটনার চিত্র বড়ই নির্মম, নিদারুণ। বর্ণনাগুলি হৃদয়বিদারক। মুসলমানগণের পরস্পরের আত্ম-সংঘাতের সুযোগে অন্যরাও তাদেরকে আরো কঠোরতম কায়দায় নিপীড়ন করার প্রয়াস

পাচ্ছে। অত্যন্ত নিন্দনীয় ভাষায় ঐশীগ্রন্থ আল কুরআনের ওপর কলঙ্ক আরোপ করার সুযোগ নিচ্ছে। এক মুসলিম দেশ অন্য মুসলিম দেশকে ধ্বংস করার জন্য এবং এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে হত্যা করার ইচ্ছায় কত যে ভয়ঙ্কর প্রচেষ্টায় কৌশল খাটাচ্ছে তার বিবরণ শুনলে আত্মা আঁৎকে ওঠে, প্রাণ মুর্ছা যাওয়ার উপক্রম হয়। আমরা শুনেছি এবং জেনেছি যে, পবিত্র রমযান মাসে এমনকি ঈদের আনন্দ উৎসবেও ধ্বংসাত্মক এ বর্বর কর্মের প্রতিযোগিতার কোন অবসান হয় নি। এ অবস্থায় বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় ইসলামের সূচনাকালে জীবন কতই না সুন্দর ছিল। মানব হিতৈষণায় কত অসাধারণ অবদান ছিল মুসলমানদের।

তবে প্রকৃত কথা হলো– ইসলাম বর্তমান কালের নিখিল-বিশ্বের সব মানুষের জন্য ঐশী জগতের শান্তি ও প্রেমের বাণী নিয়ে এসেছে। সব দেশের সবাইকে (কেবল মুসলমানকেই নয়) শান্তির বারি ধারায় অবগাহন করানোই হলো ইসলামের মূলমন্ত্র। কিছুদিন হলো আমরা একটি ঈদ– ঈদুল ফিতর উদযাপন করেছি। সামনে ঈদুল আযহা উদযাপন করব। এই ঈদে তথা পরম এই খুশীর দিনে নামাযের ময়দানে আমরা বুকে বুক রেখে কোলাকুলি করে আমাদের এই মূলমন্ত্রেরই পুনরাবৃত্তি করে থাকি। আমরা শান্তির দূত। শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের কাম্য। সবার জন্য শান্তি। Humanity is First, এখন প্রশ্ন হলো, যে ধর্মের নীতি বাক্য (moto) এত সুন্দর বিনয়ের ও শান্তির তা সত্বেও এ ধর্মে কেন এত সংঘাত? এত সংহার? এ ধর্ম কেন আজ অন্যদের দ্বারা এত বিরূপভাবে সমালোচিত এবং এত করে নিন্দনীয়? কেন এতকরে তার দুর্গন্ধময় দুর্নাম রটছে? তার অনুসারীদের মধ্যে কেন রক্তের বন্যা? ইসলাম তো এসেছে বিশ্বের সব সৃষ্টির জন্য রহমত স্বরূপ। এমন সব কর্মই কী তার রহমতের নমুনা!

আমরা আগামী যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ আরো একটি ঈদ উদযাপন করব যাকে আমরা "ঈদুল আযহা" বলে থাকি। এই ঈদ, কোন্ শিক্ষা হতে এলো এবং বছরান্তে আমাদেরকে কি শিক্ষা দিতে আসে তা প্রণিধান করা অবশ্যক। আজ হতে প্রায় ৪ হাজার বছর পূর্বে মানবজাতিকে উপলব্ধি করানোর জন্য খোদার পক্ষ হতে এ শিক্ষা আগত। আদি পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তদীয় পুণ্যবান পুত্র ইসমাঈলের জীবনের স্মরণীয় ও বরণীয় এই ঘটনা। হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর পিয়ারে খোদার অভিপ্রায়কে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রিয় পুত্রকে যবেহ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। (এক স্বপ্ন দর্শনের তাগিদে)। তিনি (আ.) যখন পুত্র ইসমাঈলের সৌজন্যে তাঁর এই সিদ্ধান্ত জানালেন তখন মা হাজেরার সযত্নে লালিত ধর্মের অপরূপ সুন্দর শিক্ষায় শিক্ষিত সেই দুলাল কি জবাব দিয়েছিলেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন "হে আমার পিতা! তুমি যা আদিষ্ট হয়েছে তা-ই কর। ইনশাআল্লাহ্ তুমি আমাকে ধৈর্যশীলদের মাঝে পাবে। অতঃপর ইব্রাহীম (আ.) প্রিয় পুত্রকে যবেহ করার জন্য কপাল উপুড় করে শোয়ালেন" (৩৭:১০৩-১০৪)। এ ঘটনা প্রবাহে আমরা কী শিক্ষা লাভ করি? এ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য শিক্ষা হলো খোদা তা'লার অভিপ্রায় বাস্তবায়নের তাগিদে পিতা যেমন দৃঢ় ছিলেন পুত্রও তেমনিভাবে উৎসর্গীত ছিলেন। এখানে উভয়ের মাঝে কোনভাবেই কোন বিতর্কের অবতারণা হয়নি। পুত্রকে যবেহ করা হবে– এ ব্যাপারেও পুত্রের মুখে কোন প্রতিবাদ নেই। খোদার সন্তুষ্টি অর্জনে পুত্র জীবন দিতে প্রস্তুত। কত বিনয় ও কত বড় মর্যাদার এই কুরবানী যার উপমা ধর্মের ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। অসাধারণ ধৈর্যধারণ ও উচ্চমানের ত্যাগ দ্বারাই খোদার সন্তুষ্টি লাভ সম্ভব– মহান এ ঘটনা আমাদের জন্য এ শিক্ষাই বর্ণনা করে। কোন কালেই আর কোন ধর্মই মানুষের জীবন হনন করে আর সহায় সম্পদ বিনষ্ট করে বিজয় লাভের চেষ্টা করেনি। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে যুদ্ধে ইসলামের শত্রুগণ যারা মুসলমানের কলিজা চিবিয়েছে, দুই ঘোড়ায় দুই পা বেঁধে দুই দিকে ছুটিয়ে যারা মুসলমানকে দুই টুকরা করে হত্যা করেছে এমন নৃশংস অপরাধীকেও মহান রসূল (সা.) ইসলামের বিজয়ের দিনে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এমন সুমহান নজীর উপস্থাপনকারী ইসলামের অনুসারীগণ আজ ইসলামের তথাকথিত বিজয়ের নামে কতনা নিকৃষ্ট কাজ করছে, যা শুনলে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়। চোখে কান্না নামে। অন্তরে ধিক্কার লাগে। সমস্ত বিশ্বব্যাপী মানুষকে হত্যা করার চিন্তায় আজ যত অর্থ ব্যয় হচ্ছে এর শতাংশের এক অংশও মানবকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে না।

সুতরাং হে মুসলমানগণ! আসুন, অন্ততপক্ষে আমরা এহেন হীন কর্ম হতে বিরত থাকি। পারতপক্ষে আমাদের দ্বারা যেন এমন ধরনের নির্মম কাজ আর একটিও সংঘটিত না হয়। আসুন, আমরা হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তদীয় ছেলে হযরত ইসমাঈল (আ.) ঈদুল আযহায় আমাদেরকে যে অপরূপ শিক্ষা দিয়ে গেছেন তদ্বারা ইসলাম সেবার কাজে ব্রত থাকি। ইসলামকে ইসলামের প্রদত্ত শিক্ষার আলোকে সেবা করুন। অন্যথায় ইসলাম বিজয় লাভ করবে না। পক্ষান্তরে তাকে লাঞ্ছিত করা হবে। তার অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষাকে কলঙ্কিত করা হবে। প্রকারান্তরে তা-ই করা হচ্ছে। সুতরাং বিকৃত কর্ম সাধন হতে বিরত থাকুন। স্বর্গ জগতের অভিপ্রায়িত একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদে সেদিন ইব্রাহীম (আ.) এর ছেলে হযরত ইসমাঈল (আ.) যে আদর্শে জীবন উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত ছিলেন আপনারা বরং সে আদর্শ অবলম্বনেই ইসলামের সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করুন। বছরান্তে আগত ঈদ আমাদেরকে এই শিক্ষা অনুসরণেরই তাগিদ দেয়। পক্ষান্তরে আত্মঘাতী বোমা হামলায় ইসলামের সেবা করার চেষ্টাকে ঈদ সর্বৈব ঘৃণা করে। পবিত্র কুরআন বলে–"এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের পরম দয়াময়" (৪:৩০)। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "একজন বিশ্বাসী কখনো আত্মহত্যা করতে পারে না", (মলফুযাত ৩য় খন্ড)। ধর্মের নামে এমনসব অপকর্ম কোন ভাবেই ঈদের আদর্শরূপে গৃহীত হতে পারে না। আমাদের জাতীয় কবি কত না সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "অ তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্ব-নিখিল ইসলামে মুরীদ"। তিনি আমাদেরকে ইসলামে মুরীদ করার ব্যাপারে প্রেম প্রদানের বিষয়টির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। কবি একথা বলেননি যে, "তুই

বোমা মেরে কর বিশ্ব-নিখিল ইসলামে মুরীদ"। আজ যারা এমনটি করছেন তারা ঘৃণীত অপরাধ করছেন। ইসলামের সুখ্যাত সৌন্দর্যকে কুখ্যাত করছেন।

মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা হলো, যুদ্ধে নারী ও শিশুকে হত্যা করবে না। অসুস্থ ও বৃদ্ধদের মারবে না। কারোর উপাসনালয় ও প্রাচীন ঐতিহ্যসমূহকে ধ্বংস করবে না। কৃষিজ ফসল বিনষ্ট করবে না। যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" সাক্ষ্য দেয় তাকে হত্যা করবে না, এই হলো ইসলামের সেবা কল্পে তার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করার শর্ত। মানবদরদী মহান রসূলের মহান শিক্ষাকে উপেক্ষা করে ইসলামের স্বার্থ রক্ষার নামে যুদ্ধ করা অনৈসলামিক কাজ। কুরআনী শিক্ষার বিপরীত কাজ। এমনসব বরং ইসলামের দুর্ণামের কারণ। তদ্রূপ করলে আমরা কোনভাবেই জগদ্বাসীকে ইসলামের অনুপম শিক্ষার আদলে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবো না। এরজন্য আমরা বরং খোদা সমীপে অগ্রহণীয় হবো। রসূল করীম (সা.)-এর আরো একটি বাণীর প্রতি তথাকথিত যিহাদী ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তিনি (সা.) বলেছেন, "একজন মুসলমানকে হত্যা করা অপেক্ষা পৃথিবীর বিলোপ সাধন আল্লাহ্‌র নিকট নিশ্চয় সহজ" (তিরমিযী, নিসাই)। উদ্ধৃত এই হাদীসের শিক্ষা নিশ্চয় সাধু-সজ্জনের আত্মাকে প্রকম্পিত করে। হে উগ্রবাদী নামধারী যিহাদী ভাইগণ! সাবধান হউন। ইসলামের শুভামন্ডিত শিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত থাকুন। তার প্রদত্ত আদর্শে দাঁড়িয়ে তার সেবা করুন। এটা থেকে তিলার্ধ পরিমাণও বিচ্যুত হবেন না। মূলকে ভুলে গিয়ে, সত্য থেকে সরে গিয়ে ইসলামের সর্বনাশ করবেন! দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। আপনাদের কর্মকান্ডকে যদি সত্যের মানদন্ডে জরীপ করা হয় তবে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আপনারা নিশ্চয় অন্যায় করেছেন, জুলুম করছেন। শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে জগতে অশান্তি সৃষ্টি করছেন।

শেষে এসে একটি প্রবাদ বাক্যকে স্মরণ করতে হচ্ছে।

"যার কাজ তারই সাজে
অন্যে গেলে লাঠি বাজে"।

অর্থাৎ যার কাজ তাকেই সেকাজ করা উত্তম ও বাঞ্ছনীয়। অন্যজনে তা করতে গেলে সে তা যথাযথ করতে পারে না, পরন্তু লাঠির প্রয়োজন হয়। উল্লেখ্য যে, ইসলামকে তার দুরাবস্থা ও দুর্দিন হতে রক্ষাকল্পে খোদা তা'লা জগতে তার এক প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। তিনি হলেন নবী আকরাম (সা.)-এর গোলাম মসীহ্ মাওউদ (আ.)। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকেই কেবল ইসলামের তাবৎ দূরাবস্থা দূর করার একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করেছেন। সুতরাং তাঁকে ব্যতীত অন্য কেউ একাজের অনধিকার চর্চা করলে ইসলামের দূরাবস্থা দূর তো হবেই না বরং তা আরো প্রকট রূপ ধারণ করবে। মূলত এখন তা-ই হচ্ছে। পক্ষান্তরে শান্তির সেই দূত শান্তির পথেই অশান্ত-পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা কল্পে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি (আ.) যুদ্ধকে রহিত করে, ধ্বংসের নির্মম সব কর্ম পরিহার করে ইসলামের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার এক ঐশী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তিনি নিখিল-বিশ্বে ইসলামকে ধর্মের শ্রেষ্ঠ আসনে বসানোর জন্য অসম্ভব সুন্দর ও অসাধারণ প্রেমের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এখন আমাদের সবার ওপর এই দায়িত্ব বর্তায় যে, আমরা সবাই যেন স্বর্গীয় সেই মহাপুরুষের কর্মপ্রচেষ্টায় সর্বাত্মক সহযোগিতা দান করি। এক্ষণে তাঁর সাথে বৈরীতা করে স্ব স্ব মনগড়া চেষ্টায় ইসলামের বিজয় সাধন কোনভাবেই সম্ভব হবে না। কেননা তা হবে খোদার সিদ্ধান্তের পরিপন্থী কাজ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), যিনি হলেন খোদা প্রদত্ত প্রতিনিধি যাঁকে খোদা মনোনীত করেছেন ইসলামের হারিয়ে যাওয়া গৌরব ও সম্মানকে পুনরুদ্ধারকল্পে। তিনি (আ.) মহাপরাক্রমশালী খোদার সাহায্য ও অনুকম্পাকে সম্বল করে তাঁর সে দায়িত্ব সম্পাদনের মহা-পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। আর সেই পরিকল্পনা হল– যুদ্ধ নয়, জনবল কিংবা অর্থবলের প্রতাপে নয় বরং আকাশের সম্মানিত রাসূলের (সা.) পুণ্যময় শান্তির বাণী সাথে করে শান্তির মাধ্যমে জগত বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এরজন্য দোয়া এবং কলমই হবে একমাত্র হাতিয়ার। কেবল এই দুই অস্ত্রই, সবার দৃষ্টিতে যা অসম্ভব, সেই কাজকে সম্ভবে পরিণত করবে। অতএব এ উদ্দেশ্যে তিনি (আ.) ৮৮ খানা পুস্তক প্রণয়ন পূর্বক তাঁর অনুসারীদের হাতে তুলে দিয়ে তাঁর পরিকল্পিত মহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর অন্তর্ধানের পর তাঁরই স্থলাভিষিক্ত সম্মানিত জামাতের খলীফাগণ পর্যায়ক্রমে এ কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আরো অনেক-অনেক কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। দেশে দেশে ইসলামের আযানের ধ্বনি উচ্চারণের প্রয়োজনে একের পর এক মসজিদ নির্মাণ করে চলছেন। হাজার হাজার "ওয়াকফে নও" তৈরী করছেন যারা ইসলামের কল্যাণময় শিক্ষা লাভ করে পৃথিবীর প্রত্যন্তঅঞ্চলে গিয়ে ইসলামের বিজয়ের পক্ষে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অবদান রাখছেন।

এ কাজে তার অন্য আর একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হলো এমটিএ (মুসলিম টিভি আহমদীয়া)। এর মাধ্যমে জামাতের খাদেমগণ অহোরাত্রি মহান কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবমন্ডিত রসূল (সা.)-এর অনুপম প্রেমের বাণী প্রচার করছে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে। এ জামা'তের বর্তমান খলীফা পৃথিবীর শক্তিধর দেশের বড় বড় বক্তব্য-মঞ্চে দাঁড়িয়ে "কেবল ইসলামই মানবজাতির ধর্ম ও অনন্য শান্তির ধর্ম" এ সত্য জলদগম্ভীর কণ্ঠে প্রচার করে যাচ্ছেন। হে বন্ধুগণ আমার! সময় আর বেশী দূরে নয়, মাত্র দুইশত বছরের প্রয়োজন। অতঃপর আপনারা দেখবেন এ তথ্য অবশ্যই সত্যে পরিণত হয়েছে। কেননা আহমদীয়া জামাত ইসলামকে বাঁচাতে দিনের পর দিন আজ ইসমায়িলী বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ কুরবানী করে যাচ্ছে। এ কুরবানী কখনো বৃথা যাবে না। যেতে পারে না। কারণ এ পরিকল্পনায় মহান খোদার একান্ত সাহায্য রয়েছে।

এর জন্য খুনোখুনি বা নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরানোর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন কেবল বিগলিত চিত্তের দোয়া ও আন্তরিক ত্যাগ-তিতিক্ষা।

কুরবানীর প্রকৃত তাৎপর্য

মওলানা মোহাম্মদ সোলয়মান, মুরব্বী সিলসিলাহ

আর কিছুদিন বাদেই আসছে আমাদের প্রতীক্ষিত ঈদুল আযহিয়া। মুসলমানদের মাঝে আনন্দের এক উত্তাল ঢেউ বয়ে চলছে। পরিবারের সবাই নতুন জামা-কাপড়, বাসন-কোসন, আসবাবপত্র ক্রয়ে ব্যতিব্যস্ত। চারদিকে কুরবানীর পশু কেনার তোর-জোড় শুরু হয়ে গেছে। কেউবা গ্রামের বাড়ি পরিবারের সাথে ঈদ আনন্দ করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন। প্রায় সব ঘরেই কম বেশী পশু জবাই করা আর তা রান্না করে খাওয়ার সকল প্রস্তুতি সূচারুরূপে সম্পন্ন করে ফেলেছেন।

ঈদের দিন এলেই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পশু জবাহ হবে। রক্তে এই পৃথিবীর বুক রঞ্জিত হবে। সকলের বিশ্বাস এই পশু জবাই এর মাধ্যমে তারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করবেন বা প্রিয়ভাজন হয়ে যাবেন। আরবী ভাষায় নৈকট্যের আরবী হল, **'কুরবুন'** আর এ থেকে ঈদুল আযহিয়ার নাম করণ হয়েছে 'কুরবানী'-র ঈদ। অর্থাৎ এই ঈদ তথা মহা-আনন্দ খোদার নৈকট্য লাভে এবং তাঁর প্রিয়পাত্রে পরিণত হবার মাঝে। যেহেতু পশু কুরবানী একজন বান্দাকে সবেগে আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত করে, তাই এটিকে কুরবানী বলা হয়।

আরবী ভাষায় পশু জবাইয়ের এই কুরবানীকে **'আন-নুসুকু'** বলা হয়। এই শব্দের আভিধানিক অর্থ হল আনুগত্য ও দাসত্ব। যে শব্দের অর্থ অনুগত্য ও দাসত্ব, সেই একই শব্দকে পশু জবাইয়ের জন্য ব্যবহার স্পষ্ট করছে, আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে পশু জবাই মুখ্য নয় বরং প্রবৃত্তির লাগামহীন ঘোড়ার শিরচ্ছেদ করে তাকে নিথর করে দিয়ে দাসে পরিণত করে দেয়াই কুরবানীর উদ্দেশ্য। একথাই আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۗ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٣٨

অর্থাৎ, এগুলোর মাংস ও এগুলোর রক্ত মোটেও আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, বরং তাঁর কাছে তোমাদের তাকওয়া পৌঁছে। এভাবেই তিনি এগুলোকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন যেন তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, কারণ তিনি তোমাদের হেদায়াত দান করেছেন। আর তুমি সৎকর্মপরায়ণদের সুসংবাদ দাও। (সূরা হজ্জ: আয়াত ৩৮)

অতএব জবাইকৃত পশুর মাংস ও রক্ত আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয়তার কোন জিনিস নয় বরং কু-প্রবৃত্তিকে, কে কতটুকু জবাই করতে পারে সেটাই হবে বিচার্য বিষয়।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে যেসব অনুশাসন দিয়েছেন, তা নিজের ইচ্ছার বা মনবাসনার বিরুদ্ধে গেলেও তা পালন করে চলাই হল প্রকৃত কুরবানী। প্রতীকিভাবে পশু জবাইয়ের মাধ্যমে আমরা এই অঙ্গীকারই করি।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের পর সমাজের দিকে তাকিয়ে একটু দেখুন একদিকে তারা

ধর্মীয় গাম্ভীর্যের সাথে কুরবানী করছে, অপর দিকে চরম অন্যায় ও নৈরাজ্যে লিপ্ত রয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ্‌র আদেশের বিপরীতে কু-প্রবৃত্তির সেই ঘোড়াকেই সক্রিয় দেখছি। এর অর্থ হল, অধিকাংশ মুসলমান আজ এই তাৎপর্য সম্পর্কে একেবারেই অনবহিত, তারা উদর পূর্তি ও আনন্দ-ফূর্তির জন্য পশুর পর পশু জবাই করে যাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু রূপকথার সেই অমর দৈত্যের মত কু-প্রবৃত্তির ঘোড়া অক্ষতই থেকে যাচ্ছে।

তাই যতক্ষণ আমরা কু-প্রবৃত্তির সেই ঘোড়াকে জবাই না করব, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারব না আর সমাজে বিদ্যমান অশান্তি ও সমস্যাদি থেকেও মুক্তি পাব না। ভাই-ভাই এর মাঝে বিবাদ, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাদ, প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ, পিতা-মাতার সাথে বিবাদ, সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ, নৈতিক অবক্ষয়, এসবের মূল কারণ হল প্রত্যেকের মাঝে কু-প্রবৃত্তির সেই ঘোড়া উজ্জীবিত অবস্থায় আছে। এই কুরবানীতে যদি আমরা কুরবানীর প্রকৃত তাৎপর্য বুঝে সেই ঘোড়াকে জবাই করতে পারি তাহলে একটি শান্তি ও সৌহার্দ্যের সমাজ আমরা পেতে পারি।

আল্লাহ্ তা'লা এর উদাহরণ দেয়ার জন্য হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ঘটনা তুলে ধরেছেন। এই ঈদে এমন কোন ঈদগাহ থাকবে না যেখানে এই ঘটনার আলোচনা হবে না। কিন্তু উপরোক্ত তাৎপর্য মাথায় রেখে ঘটনাটি থেকে চলুন শিক্ষা গ্রহণ করি।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) দু'ই স্ত্রীর সাথেই সদাচরণ করেছেন। কোন স্ত্রীর কোন আচরণে যদি ইব্রাহীম (আ.) মনঃক্ষুন্নও হয়ে থাকেন এর প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া সন্তানের ওপর পড়তে দেন নি। এর ফলশ্রুতিতে আমরা দেখি, হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও বিবি সারার সন্তান হযরত ইসহাক আল্লাহ্‌র নবী হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন। অতএব, কারো আচরণে অসন্তোষ হয়ে তার সন্তানাদির যে অধিকার রয়েছে তা পূর্ণরূপে মনের বিরুদ্ধে গেলেও আদায় করতে হবে। মহানবী(সা.) বলেছেন, নারীদের মাঝে এক ধরনের বক্রতা আছে। প্রবৃত্তির পশু যতই ইচ্ছে করুক জোর করে একে সোজা করা নয় বরং কু-প্রবৃত্তিকে বশে এনে এই বক্রতাকে মানিয়ে নেয়াই কুরবানীর উদ্দেশ্য।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) নিজ স্ত্রী বিবি হাজেরা ও পুত্র হযরত ইসমাইলকে অল্প কিছু খেজুর দিয়ে জন-মানবশূন্য মরু প্রান্তরে রেখে আসার সিদ্ধান্ত বাহ্যত আত্মঘাতী, কিন্তু আল্লাহ্‌র গৃহ আবাদ করতে হবে, তাই হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহ্‌র ইবাদতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশে এমন জন-মানবশূন্য মরুভূমিতে নিজ স্ত্রী-সন্তানদের ছেড়ে আসেন। যারা স্ত্রী-সন্তানের সুখের জন্য সম্পত্তির লোভে ঘুস ও সুদের মত অবৈধ কাজে লিপ্ত, যারা নিজ স্ত্রী-সন্তানের চিন্তায় অন্যের অধিকার খর্ব করা এবং অন্যায় পথে রোজগার করে থাকেন তাদের জন্য এতে শিক্ষা রয়েছে। অভিভাবক হিসাবে না জানি কত মর্ম-যাতনায় কষ্ট পেয়েছিলেন হযরত ইব্রাহীম(আ.)। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এবং ধর্মের খাতিরে স্ত্রী-পুত্রের কোন তোয়াক্কাই করেন নি। প্রতিটি কুরবানী আজ এই তাৎপর্য আমাদের শেখাতে চায়। যদি আমরা কু-প্রবৃত্তির পশু জবাই করে স্ত্রী-সন্তানের ওপর ধর্মকে প্রাধান্য দিতে পারি তাহলে সত্যিই আমরা এবার প্রকৃত কুরবানীর ঈদ করব।

হযরত ইব্রাহীম(আ.) যখন স্ত্রী-পুত্রকে মরু প্রান্তরে রেখে ফেরৎ যাচ্ছিলেন সেই দৃশ্য সত্যিই হৃদয়-বিদারক ছিল। ফিরে যাবার সময় হযরত ইব্রাহীম(আ.) যখন স্ত্রী-সন্তানের ভালোবাসায় পেছন ফিরে তাকাচ্ছিলেন তখন হযরত হাজেরা জিজ্ঞেস করে বসলেন, আপনি কি আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নির্দেশে এখানে রেখে যাচ্ছেন হযরত ইব্রাহীম(আ.) আড়ষ্ট কণ্ঠে মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। একজন স্ত্রী হিসাবে বিবি হাজেরার ভূমিকা দেখুন, বর্তমান যুগের নারীদের জন্য এতে চমৎকার শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু শিক্ষা অর্জনের পূর্বে মনস্থির করে নিতে হবে আমাদের কুরবানী কি শুধু মাংস খাওয়া এবং অলংকারে সেজে-গুজে ঘুরে বেড়ানো, নাকি সত্যিই আমরা ধর্মীয় বিধান অনুসারে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের জন্য কুরবানী করতে ইচ্ছুক। যদি প্রকৃত কুরবানী আমাদের নারীরা করতে চান, তবে বিবি হাজেরার কাছ থেকে শেখার আছে। উত্তর শুনে বিবি হাজেরা বললেন, যদি আল্লাহ্‌র আদেশে আমাদের রেখে যাচ্ছেন তাহলে আপনি নির্দ্বিধায় যান। এক ভয়াবহ অরণ্যে এক শিশুকে নিয়ে কীভাবে কাটাবেন? একথা নিশ্চয় হযরত হাজেরাও ভেবেছেন। কিন্তু স্বামীর আনুগত্যের বাইরে চুল পরিমাণও যান নি। কোন অভিযোগ-অনুযোগও করেন নি। ধর্মের জন্য, আল্লাহ্‌র জন্য, সব কিছু বিলিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, এমনকি নিজের প্রাণও। স্বামীর আনুগত্য ও খোদার খাতিরে কেমন ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা কিছুটা অনুমান করা যায়, যখন ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর শিশুর কান্নায় সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে এক ফোঁটা পানির জন্য পর্যায়ক্রমে একাধারে ছুটে দৌড়াচ্ছিলেন। এই মহান ত্যাগ আল্লাহ্‌র কাছে এত গ্রহণীয় হয়েছে যে, হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশেই মহানবী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ(সা.)-কে প্রেরণ করেছেন।

যে স্ত্রী, স্বামীকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে, স্বামীর আনুগত্য করে এবং আল্লাহ্‌র অনুশাসনকে প্রাধান্য দেয়, সেই কুরবানীকারী, কেননা আনুগত্য কু-প্রবৃত্তির জবাই চায়। যে নারী পর্দা করে না, সে নারী স্বামীকে শ্রদ্ধা করে না, যে নারী স্বামীর আনুগত্য করে না সে নারী নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে না, যে নারী অন্যায় ও অন্যের অধিকার খর্ব

করা পছন্দ করে, কীভাবে সে কুরবানীকারী হতে পারে? অতএব কু-প্রবৃত্তির পশু জবাই করে খোদার নৈকট্যের আশায় যাত্রা করতে হবে আর সেটিই হবে প্রকৃত ঈদ।

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ছেলে হযরত ইসমাঈল (আ.) যখন খানিকটা বড় হলেন তখন পিতা তাকে জিজ্ঞেস কওে,'আমি স্বপ্নে দেখি তোমাকে আমি জবাই করছি, তুমি কী বল' ? বালক ইসমাঈল পিতার অনুগত হয়ে পিতার সম্মান ও শ্রদ্ধায় এবং আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতকে প্রাধান্য দিয়ে বললেন, 'তুমি যেমনটা স্বপ্নে দেখেছ, আমাকে সেভাবেই জবাই কর, তুমি আমাকে ধৈর্যশীল পাবে'। আমাদের সমাজে আজ পিতা-মাতার সম্মান একেবারেই উঠে যাচ্ছে। যে পিতামাতা আদর-যত্ন করে সন্তানকে বড় করে তুলেছে, তার প্রতি এতটুকু সম্মানবোধ তো দূরের কথা, কৃতজ্ঞতাবোধও নেই। আজ হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কাছ থেকে সমাজের সব সন্তানের শেখার আছে, কুরবানী কাকে বলে।

যে ছেলে, পিতা-মাতার সম্মান করে না, তাদের আনুগত্য করে না এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, তারা কীভাবে কুরবানীকারী হতে পারে? যে যুবক ছেলে দৃষ্টির পর্দা করে না, নিজ লজ্জাস্থানের হিফাজত করে না, অন্যায় ও অবৈধ কাজ পরিত্যাগ করে না, অন্যের অধিকার খর্ব করতে পছন্দ করে, সে কখনই কুরবানীকারী হতে পারবে না, তবে যদি এসব কু-প্রবৃত্তির পশুকে জবাই করে নিজেকে আল্লাহর সামনে পেশ করে তাহলেই সে কুরবানীকারী হতে পারে।

বর্তমান সমাজে কুরবানীর এই তাৎপর্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পশু কিনে জবাই করে মাংস খাওয়া, এতে কী পুণ্য থাকতে পারে? নিজের আমিত্ব, নিজের অহমিকা, নিজের ব্যক্তিস্বার্থই যদি আমরা আল্লাহ্‌র জন্য বিসর্জন দিতে না পারি, আর সারা জীবন কুরবানী দিয়ে অবশেষে দেখা যাবে জীবনে একটিও কুরবানী আল্লাহর জন্য দেই নি।

এমন নেক কর্মকারীদের জন্যই বলা হয়েছে, তার আমলনামা তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারা হবে। আল্লাহ আমাদের সাবাইকে এমন আমল থেকে রক্ষা করুন আর কুরবানীর প্রকৃত তাৎপর্য বুঝার তৌফিক দান করুন। আমীন ॥

আমাদের ধর্ম বিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন,

"আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্** কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানি। আমরা ফিরিশ্‌তা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্‌ ও রসূল (সা.) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দেই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশী করি না। যা কিছু রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি– আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি– আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।" ('নূরুল হক', খণ্ড ১, পৃ. ৫)

বায়তুল্লাহ নির্মাণ সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যের সাথে মহানবী (সা.)-এর গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান

হযরত খলীফাতুল মসীহ আস্ সালেস (রাহে.)

আল্লাহ্ তা'লাই গোটা মানবজাতির মঙ্গলের জন্য এক ঘর বানিয়েছিলেন, কিন্তু তারা এর বিশালত্বকে শনাক্ত করতে পারে নাই। ফল দাঁড়ালো এই যে– সে ঘর নষ্ট হয়ে গেল এমনকি এর নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে গেল। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অনুগ্রহপূর্ণ বাণী দ্বারা সেই গৃহের 'ধ্বংসাবশেষ চিহ্ন' নির্দেশিত করে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর মাধ্যমে নবরূপে একে পুণরায় নির্মাণ করালেন আর এর সুরক্ষার জন্য ও এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এ ব্যবস্থা করিয়েছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) নিজ সন্তানকে ওই পবিত্র গৃহের জন্য উৎসর্গ করেন। এভাবে তার (আ.) বংশধরেরা এক সুদীর্ঘকাল এর সেবায় লেগে রইলো। দু'হাজার পাঁচশ' বছর ধরে সেবা ও দোয়ার ফলশ্রুতিতে সেই জাতি পুর্ণরূপে পরিপক্কতা প্রাপ্ত হলো আর বিশ্বজোড়া সার্বজনীন শরীয়তের দায়িত্বসমূহকে অসহায়ত্বের কবল থেকে রক্ষা করার শক্তি ও যোগ্যতা নিজ মাঝে ধারণ করলো।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা এবং সূরা আলে ইমরান, ৯৭-৯৮ ও আল বাকারার ১২৬-১৩০ আয়াতসমূহ তেলাওয়াতের পর হুযূর (রাহে.) বলেন, একান্তই জরুরী এক বিষয়ের উপর আমি মাত্র একটি খুতবা প্রদান করেছিলাম যার সংক্ষিপ্ত সার হলো–

আল্লাহ্ তা'লাই গোটা মানবজাতির মঙ্গলের জন্য এক ঘর বানিয়েছিলেন, কিন্তু তারা এর বিশালত্বকে শনাক্ত করতে পারে নাই। ফল দাঁড়ালো এই যে– সে ঘর নষ্ট হয়ে গেল এমনকি এর নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে গেল। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অনুগ্রহপূর্ণ বাণী দ্বারা সেই গৃহের 'ধ্বংসাবশেষ চিহ্ন' নির্দেশিত করে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর মাধ্যমে নবরূপে একে পুণরায় নির্মাণ করালেন আর এর সুরক্ষার জন্য ও এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এ ব্যবস্থা করিয়েছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) নিজ সন্তানকে ওই পবিত্র গৃহের জন্য উৎসর্গ করেন। এভাবে তার (আ.) বংশধরেরা এক সুদীর্ঘকাল এর সেবায় লেগে রইলো। দু'হাজার পাঁচশ' বছর ধরে সেবা ও দোয়ার ফলশ্রুতিতে সেই জাতি পুর্ণরূপে পরিপক্কতা প্রাপ্ত হলো আর বিশ্বজোড়া সার্বজনীন শরীয়তের দায়িত্বসমূহকে অসহায়ত্বের কবল থেকে রক্ষা করার শক্তি ও যোগ্যতা নিজ মাঝে ধারণ করলো।

আমি আরও বলেছিলাম– এ আয়াতে যা আমি তেলাওয়াত করেছি, তাতে আল্লাহ্ তা'লা ওই তেইশটি মহান উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন যার সম্পর্ক বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের সাথে রয়েছে আর ওই যাবতীয় লক্ষ্যের অর্জন নবী করীম (স.)-এর আবির্ভাবের সাথে সম্পৃক্ত। ওই উদ্দেশ্যাবলী থেকে পাঁচটি উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি গত খুতবায়– আপনারা, যারা আমার প্রিয়জন তাদের সামনে স্বীয় ধ্যানধারণা ও উপলব্ধি বর্ণনা করেছি। প্রথমত- এটা সেই ঘর **উযিআ' লিন্নাস**, গোটা মানবজাতির কল্যাণার্থে যা

নির্মাণ করা হচ্ছে, দ্বিতীয়ত **মুবারাকান**-এর মাঝে 'মুবারক' (কল্যাণমন্ডিত) হওয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়- বাহ্যিকভাবেও আর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণেও, তৃতীয়ত- **হুদাল্লিল আ'লামীন** সমগ্র জগতের জন্য আমরা একে হেদায়াত-এর কারণ ও উৎসস্থল বানাতে চাই, আর জীবন চলার পথে হেদায়াত-এর অন্তর্নিহিত সব অর্থে একে আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বজগতের জন্য হেদায়াতের কেন্দ্র বানিয়েছেন।

চতুর্থত এই যে, **ফিহে আয়াতিম বায়্যিনাত** অর্থাৎ ঐশী নিদর্শনাবলীর এমন ধারাবাহিকতা এস্থান থেকে জারী রাখা হবে যা কিয়ামত কাল পর্যন্ত সজীব থাকবে আর ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের এমন ফল্গুধারা উৎসারিত হবে যা কখনও নিঃশেষিত হবে না। আর পঞ্চমত **মাক্বামু ইব্রাহীম** বাক্যাংশ প্রকাশ করছে যে ওই ইবাদত যা প্রেমপ্রীতি ভালোবাসা ও মায়ামমতার ভিতের উপর গড়ে তোলা হবে, সেই ইবাদতের কেন্দ্রভূমি হবে এটি, আর ভবিষ্যতে সকল যুগের সকল জাতির প্রতিনিধিত্বশীল এমন এক জাতির উদ্ভব ঘটানো হবে যারা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ন্যায় আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে পাপমুক্ত হয়ে তাঁর (আল্লাহ্ তা'লার) ভালোবাসায় মস্তকাবনত হয়ে থাকবে আর আল্লাহ তা'লার নৈকট্যপূর্ণ সান্নিধ্য লাভের দুয়ার তাদের জন্য চিরতরে উন্মুক্ত করে রাখা হবে।

এই **পাঁচটি উদ্দেশ্য–** যেগুলো সম্পর্কে আমি গত জুমুআর খুতবায় বিশদভাবে বর্ণনা করেছিলাম। কারণ আমাকে ওই উদ্দেশ্যসমূহের প্রত্যেকটির বিষয়ে পূনর্বার আলোচনায় আসতে হবে, এটা সাব্যস্ত করার জন্য যে ওর প্রত্যেকটিরই সম্পর্ক রয়েছে নবী করীম (সা.) এর আবির্ভাবের সাথে, আর সেই সাথে এটাও উল্লেখ করতে যে, সেই উদ্দেশ্য কীভাবে আর কেমন উচ্চ মর্যাদার সাথে অর্জিত হয়েছে। এজন্য আমার ইচ্ছা আজ এই যে, সংক্ষিপ্তভাবে আমি সেই উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করি; আর চেষ্টা করবো ঐ তেইশটি উদ্দেশ্যের মধ্যে যেগুলোর বর্ণনা অবশিষ্ট রয়ে গেছে সেগুলো আজকের খুতবায় বর্ণনা করে দেবার, যতটা আল্লাহ্ তা'লা চান।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **ওয়ামান দাখালাহূ কানা আমিনান** এটা হল বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের **ষষ্ঠ উদ্দেশ্য**। যে কেউ এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি যে ঐরূপ ইবাদত করবে বায়তুল্লাহ্‌র সাথে যার সম্পর্ক, সে ইহজগতের ও পরকালের জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পেয়ে খোদার নিরাপদ আশ্রয়ে এসে যাবে এবং তার অতীতের সব গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। অতএব বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের ষষ্ঠ উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ তা'লার আরাধনায় এমন এক গৃহ নির্মাণ করে দেয়া যার সাথে অন্যান্য ইবাদতকর্মও সম্পর্ক রাখে। আর যে কেউই একাগ্রতাপূর্ণ ইচ্ছার সাথে পূর্ণাঙ্গীন ও পরিপূর্ণরূপে আরাধনা করবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি এখানে এই ব্যক্ত হয়েছে যে, তাদের পূর্ববর্তী যাবতীয় পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে আর দোযখের আগুন থেকে তারা সুরক্ষা লাভ করবে।

বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের **সপ্তম উদ্দেশ্য–** আল্লাহ্ তা'লা এখানে এটা জানিয়েছেন যে **ওয়া লিল্লাহি আলান্‌নাসি হিজ্জুল বায়তি** হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশধর কিংবা কেবল আরববাসীদের উপরই এটা ফরয নয় যে তারা বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করুক বরং বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য এটা যে জগতের সবজাতি বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করার জন্য এই পবিত্র ভূমিতে সমবেত হোক (আমি মনে করি, এসব উদ্দেশ্য হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের সময়েই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। কুরআন করীমে কুরাইশ জাতির কর্মোদ্দীপনার ব্যাপারে যেমনটা উল্লেখ পাওয়া যায়)।

যাহোক, আল্লাহ্ তা'লাই হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে জানিয়েছেন এটা এমন একটি ঘর যে বিশ্বের সব জাতি যারা আমার উপর ঈমান আনবে আমার রসূল (সা.)-এর উপরও ঈমান রাখবে এবং খাতামান্নবাবীঈন (সা.) এর হাতে হাত রেখে আমার আনুগত্যের জোয়াল নিজেদের কাঁধে তুলে নেবে, তাদের জন্য বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ ফরযরূপে (বাধ্যতামূলক) নির্ধারণ করে দেয়া হবে। আর এভাবে সেই স্থানকে সৃষ্টির প্রত্যাবর্তনস্থল এবং জগতের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করে দেয়া হবে।

অষ্টম উদ্দেশ্য– অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের অষ্টম উদ্দেশ্যরূপে যা নির্ধারণ করা হয়েছে তা হল **মাছাবাতান** (বার বার মিলিত হওয়ার স্থান)-এই শব্দে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে বিশ্বের জাতিগুলো দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়বে আর যে যুগে এই বিভক্তি চরমরূপ ধারণ করবে সে যুগে এমন এক রসূল প্রেরিত হবেন যিনি বায়তুল্লাহ্‌র এই উদ্দেশ্যকে পূর্ণতাদানকারী হবেন আর বিভাজিত জাতিসমূহ, দল ও উপদলগুলোকে একই কেন্দ্রে এনে একতাবদ্ধ করবেন। তিনি সবাইকে **আলা দিনিওঁ ওয়াহিদিন**-এ নিয়ে আসবেন। অতএব এখানে ব্যক্ত হয়েছে যে একযুগে বিভাজন যখন চরমে পৌঁছে যাবে তখন আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা এটাই যে সেই যুগে এমন এক রসূল পাঠান যিনি সবজাতিকে **উম্মাতাওঁ ওয়াহিদাতুন** বানিয়ে দেন।

নবম উদ্দেশ্য আমনান বলা হয়েছে– এটা অর্থাৎ এটাই হলো সেই ঘর যা **আমনান লিন্নাস**- এখানে এর অর্থ হল, আমরাই নিজেদের এই ঘরকে এমন বানাতে চেয়েছিলাম যে, এর মাধ্যমে এবং শুধু এরই দ্বারা বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার সৌভাগ্য লাভ হবে। কারণ কেবল এটিই এক ঘর যাকে **বায়তুল্লাহ্** আখ্যায়িত করা যায়, একে পরিত্যাগ করে এর শিক্ষাকে অবমূল্যায়ন করে যার সম্পর্ক এই ঘরের সাথে রয়েছে, বিশ্বের যে কোন সংস্থা শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে দেখে নিক, তারা কখনই এতে সফল হবে না। বিশ্বের প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা কেবল সে সময় আর কেবলমাত্র সেই শিক্ষার উপরই আমল করার ফলে লাভ হতে পারে, যে শিক্ষা সেই মহান নবী জগতসমক্ষে উপস্থাপন করবেন যাঁর উত্থান ঘটানো হবে পবিত্র কাবাগৃহ থেকেই।

আমান-এর অপর এক মর্মার্থানুযায়ী **আমনান লিন্নাস**-এর অর্থ এটাও যে, আধ্যাত্মিকভাবে জগদ্বাসীর অন্তরের স্বস্তি শুধুই পবিত্র মক্কা আর শুধু সেই শেষ শরীয়তের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টি করার ফলে অর্জিত হতে পারে যা শেষ শরীয়ত মক্কায় প্রকাশিত হবে আর বিশ্বের সকল জাতিকে ডেকে ডেকে তাদেও নিজেদের প্রভূ-প্রতিপালকের প্রতি আহ্বান করতে থাকবে।

আর যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরের স্বস্তি ঐ সময়ে লাভ হতে পারে, যখন তার স্বভাবজ ও প্রকৃতিগত চাহিদাগুলোকে সেই সুশিক্ষায় সম্পূর্ণরূপে গড়ে নিতে সক্ষম হয় আর আল্লাহ্ তা'লা মানুষের মাঝে যত রকম শক্তি সামর্থ্য ও যোগ্যতা সৃষ্টি করেছেন সেগুলোর লালন-পালন ও পরিপোষণ করতে

সমর্থ হয়, অর্থাৎ শিক্ষাদানের একটাই ঘর হবে– **মক্কা**, যা সত্যিকারভাবে জগতের অন্তরে স্বস্তিদানকারী অর্থাৎ উভয় অর্থ এখানে প্রযোজ্য হয়– এক তো হল, শান্তি ও নিরাপত্তার সৌভাগ্য যদি বিশ্ব পেতে চায় তবে তা মক্কার বদৌলতে। দ্বিতীয়ত, বিশ্ববাসী যদি অন্তরে শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে চায়, নিরুদ্বেগ ও উৎকণ্ঠামুক্ত বিশ্ব পেতে চায় তাহলে তাও কেবল ঐ পবিত্র শিক্ষা লাভের ফলেই সম্ভব, যা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

পবিত্র কাবা গৃহ নির্মাণের **দশম উদ্দেশ্য** ও লক্ষ্য এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বর্ণনা করেছেন **ইত্তাখিযু মিম মাক্বামি ইব্রাহিমা মুছোয়াল্লা**। পূর্বের এক আয়াতে **মাকামু ইব্রাহীম**-এর উল্লেখ পাওয়া যায় আর তা থেকে বুঝা যায় যে, এই আবাসস্থল এমন এক গহ্ , যে স্থানে সত্য ও চিরন্তন ইবাদতের ভিত্তি রাখা হয়েছিল, পরম উপাস্যের সাথে গভীর ভলোবাসা আর প্রেমাস্পদের প্রতি বিনীত আত্মসমর্পণের ঝর্ণা থেকে যা উৎসারিত। **ওয়াত্তাখিযু মিম্ মাক্বামি ইব্রাহীমা মুছোয়াল্লা'**-য় ইবাদতের সেই উল্লেখ রয়েছে যা অনুতাপ আর বিনয় থেকে উৎপত্তি লাভ করে প্রকাশিত হয়। আসলে, আল্লাহ্ তা'লা এখানে বলেছেন যে বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের এক উদ্দেশ্য– এমন এক জাতির জন্ম দেয়া, লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েও যারা বিনয়ের সাথে নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে বিনীত ইবাদতের দিক থেকে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর আদর্শের প্রতিচ্ছবি প্রতিষ্ঠাকারী হবে এবং ইসলাম প্রচারের কেন্দ্রসমূহকেও সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের **এগারোতম উদ্দেশ্য**– বর্ণিত হয়েছে, **ত্বাহ্হিরা বায়তিয়া** আর এতে আমাদের শিখানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লার এটা পরিকল্পনা যে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিতে পবিত্র এই কাবাগৃহ শিক্ষালয়স্বরূপ অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গোটা দুনিয়ার জন্য একে শিক্ষা কেন্দ্র বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

কাবাগৃহ নির্মাণের **বারোতম উদ্দেশ্য**– ব্যক্ত করা হয়েছে **লিত্ত্বাইফীনা** অর্থাৎ জাতিসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ বার বার এখানে এসে সমবেত হতে থাকবে। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে এই সংবাদ দিয়েছিলেন যে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহের প্রতিনিধিরা বার বার এখানে তওয়াফ করতে আসতে থাকবে, আর সেই সব উদ্দেশ্যকে পুরা করার জন্যও আসবে যেগুলো পবিত্র কাবাগৃহের সাথে সম্পর্ক রাখে।

তেরোতম উদ্দেশ্য– বর্ণনা করা হয়েছে **ওয়াল আ'কিফীনা**। এ উদ্দেশ্যের কারণেই পবিত্র কাবাগৃহ নবরূপে নির্মাণ করা হচ্ছে যে, এর মাধ্যমে এমন এক জাতি সৃষ্টি করা হোক যারা নিজেদের জীবন খোদা তা'লার পথে উৎসর্গকারী হয়ে বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের উদ্দেশ্য পূর্ণকারীও হবে।

চৌদ্দতম উদ্দেশ্য– এখানে এটাই বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা চাচ্ছেন **ওয়ার্‌রুক্কাই'স্ সুজূদ** এমন এক জাতি সৃষ্টি করা হোক যারা মহান সৃষ্টিকর্তার একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য ও নির্দেশ মান্যকারী হয়ে নিজ জীবন কাটিয়ে দেয়।

পনেরতম উদ্দেশ্য– বর্ণিত হয়েছে **বালাদান আমিনান**। **আমান** শব্দটি এই আয়াতে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে উল্লেখিত হয়েছে। এখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমরা এই ঘরকে দুনিয়ার অত্যাচারমূলক আক্রমণ থেকে স্বীয় নিরাপত্তামূলক আশ্রয়ে রাখবো আর এমন কোন হামলা যা পবিত্র কাবা গৃহকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে করা হবে তাতে তারা সফলকাম হবে না বরং আক্রমণকারীদের এমনভাবে ধ্বংস করা হবে যে তারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে যাতে এ থেকে জগত এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে সেই নবী– যাকে আমরা এখানে আবির্ভূত করতে চাই সে-ও খোদা তা'লার নিরাপদ আশ্রয়েই থাকবে আর জগতের কোন শক্তি তাকে (নবীকে) বধ করতে বা তার মিশনকে নিষ্ফল করতে সক্ষম হবে না আর এ থেকে জগত এই শিক্ষা লাভ করবে যে নিষ্পাপ নবীকে যে শরীয়ত দেয়া হয় তা চিরন্তনরূপেই তাকে দেয়া হয় আর তার হেফাযতের দায়িত্বে স্বয়ং খোদা তা'লাই থাকেন।

ষোলতম উদ্দেশ্য যা পবিত্র কাবাগৃহের সাথে সম্পৃক্ত তা হল **ওযারযুক্ আহ্লাহূ মিনাস সামারাতি**। এখানে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, নবরূপে আমি বায়তুল্লাহ্‌কে পূণর্নির্মাণ করাচ্ছি এ উদ্দেশ্যে যে, বায়তুল্লাহ্ ও বায়তুল্লাহ্‌র কল্যাণসমূহ দর্শন করে জগত যাতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে খোদা তা'লার পথে যে সব লোকেরা মৃত্যুবরণ করে এবং তাঁরই হয়ে তাঁরই রাস্তায় কুরবানী দিতে থাকে আর পার্থিবতা থেকে মুক্ত হয়ে কেবল তাঁরই জন্য নিবেদিত হয়ে যায় তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট হয় না বরং প্রেমাস্পদের দেয়া মিষ্টিমধুর ফল তাদের লাভ হয় আর বিনম্র প্রেমানুরাগপূর্ণ আমলের সর্বোত্তম ফল-লাভ তাদের জন্য অবধারিত এক নিয়তিতে পরিণত হয়।

বায়তুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠার **সতেরতম উদ্দেশ্য**– জানানো হয়েছে **রাব্বানা তাক্বাব্বাল মিন্না** বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের এটি অন্যতম উদ্দেশ্য, জগত যাতে জানতে পারে আর উপলব্ধি করতে পারে যে দোয়ার মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি লাভ করা সম্ভব। দোয়ায় নিমগ্ন হয়ে মানুষ আত্মবিলীনতা লাভ করে মৃতের ন্যায় হয়ে গেলে আকাশ থেকে ঐশী অনুগ্রহের অবতরণ ঘটে আর নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান লাভের পথসমূহ বান্দার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। অর্থাৎ আয়াতের এ অংশেও আল্লাহ্ তা'লা বায়তুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে– এই স্থানে (মক্কায়) এমন এক জাতির উদ্ভব হবে যারা যাবতীয় শর্তাবলী পালন করা সহ দোয়াকারী হবে। দোয়ায় নিমগ্ন হয়ে তারা 'মৃত-সদৃশ' এক অবস্থায় নিজ সত্ত্বা পরিপূর্ণরূপে হারিয়ে বিগলিত এক ধারায় প্রভূ-প্রতিপালকের আস্তানায় বয়ে চলবে আর তারা উপলব্ধি করবে যে আমরা নিজেদের আমলের ফল হিসাবে (প্রকৃতপক্ষে ফল হিসাবে নয়) কিছুই অর্জন করতে সক্ষম নই যতক্ষণ আমরা দোয়ার দ্বারা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহকে আকর্ষণ না করছি। তাঁর জন্য অসাধারণ কুরবানীসমূহ দেয়ার পরও তারা নিজেদের কুরবানীসমূহকে সামান্যতম মূল্যবান কোন কিছু মনে করে না বরং সর্বক্ষণ নিজেদের প্রভূ-প্রতিপালকের সমীপে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত থাকে আর অগণিত কুরবানী প্রদান করা সত্ত্বেও তাদের দোয়া এটাই হয়ে থাকে যে, 'আমরা তোমার সমীপে যা কিছু নিবেদন করছি তা এক নগণ্য উপহার, তোমার মর্যাদা সুমহান ও সুউচ্চ আর আমরা মনে করি তোমার কাছে আমাদের পেশকৃত এ উপহার গ্রহণযোগ্য নয় কিন্তু সদাশয় তুমি কৃপাকারী প্রভূ-প্রতিপালক! আমাদের নগন্য এ উপহার তুমি গ্রহণ কর। আমাদের দূর্বলতাসমূহ, আমাদের মন্দ কার্যসমূহ ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখ, দয়া ও মমতার উপকরণ সৃষ্টি কর, যাতে আমরা স্বভাব চরিত্রে আর সাধ্য সাধনায়

তোমার কাছে গ্রহণীয় হয়ে যাই', মোট কথা এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জাতির উদ্ভব ঘটাতেই আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কাবাগৃহের ভিত রেখেছিলেন।

আঠারতম উদ্দেশ্য– আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, পবিত্র কাবাগৃহ নবরূপে পুণর্নির্মাণের উদ্দেশ্য হল, জগত জানুক– খোদা তা'লার সমীপে যেসব লোকেরা এমনিভাবে দোয়ারত থাকে, নিজ প্রভু প্রতিপালকের **সামিউন** গুণের প্রতিফলন তারাই প্রত্যক্ষ করে, জগতও দেখে নেয় যে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক তিনিই, যিনি **সর্বশ্রোতা**, তিনি আমাদের দোয়াসমূহ শুনেন সেই সাথে এটা জানিয়েও দেন যে আমি তোমাদের দোয়া শুনেছি। এভাবে পবিত্র কাবাগৃহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সর্বশ্রোতা খোদা তা'লার গভীর তত্ত্বজ্ঞান লাভে জগত সক্ষম হবে।

উনিশতম উদ্দেশ্য– এটা যে, দুনিয়া এর মাধ্যমে সর্বজ্ঞানী খোদা তা'লার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবে। এমনটি হবে না যে, বান্দা নিজের অসম্পূর্ণ জ্ঞানের কারণে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে যে দোয়া করে হুবহু সেভাবেই তিনি তা গ্রহণ করে নেন, বরং বান্দা দোয়া করবে এমন ভাবে যে, বিনীত দোয়াকে উচ্চমার্গে পৌঁছে দিলে তার **রব্ব** তার প্রভু-প্রতিপালক তার দোয়া শুনবেন আর কবুল করবেন, তবে তিনি (আল্লাহ্) তা কবুল করবেন অদৃশ্য ভবিষ্যতের সম্যক জ্ঞাতা হিসেবে অর্থাৎ যে রঙে বান্দার ঐ কৃত দোয়াসমূহ কবুল হওয়া উচিত সেইরূপে।

কতিপয় দোয়া বাতিল হয়ে যাওয়া অথবা কতিপয় দোয়া ঐরূপে পূর্ণ না হওয়া যে রূপে দোয়া করা হয়েছিল, এটা সাব্যস্ত করে না যে খোদা **সামীউন** (সর্বশ্রোতা) নন বা **ক্বাদীর** (সর্বশক্তিমান) নন বরং এটাই সাব্যস্ত করে যে খোদা তা'লাই নিজ সত্ত্বায় **আল্লামুল গুয়্যুব** (অদৃশ্য ভবিষ্যতের সম্যক জ্ঞাতা)।

অতএব পবিত্র কাবাগৃহের ভিত্তি এজন্য রাখা হয়েছে যে খোদা তা'লার বান্দারা **আ'লীম** খোদার সাথে পরিচিত হোক আর তাঁকে চিনতে থাকুক, তাঁকে জানতে থাকুক, তাঁকে সনাক্ত করতে পারুক।

বিশতম উদ্দেশ্য– বর্ণিত হয়েছে **ওয়া মিন যুর্‌রিয়্যাতিনা উম্মাতাম্ মুসলিমাতাল্‌লাকা** অর্থাৎ **উম্মতে মুসলেমাকে** আমার বংশধরের মধ্যে থেকে জন্ম দিও। আল্লাহ্ তা'লা এখানে আলোকপাত করেছেন– আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে যুগে জগতের বুকে আবির্ভূত হবেন তখন তাঁর (স.) জাতি **উম্মাতাম্ মুসলেমাতান** হওয়ার যোগ্যতা ধারণে সক্ষম হবে আর ইব্রাহীম (আ.)-এর দোয়ার ফলে সেই উম্মত **উম্মাতাম্ মুসলেমাতান**-এ পরিণত হয়ে যাবে।

এর অর্থ এটাও যে ওই নবী যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে সে মক্কায় জন্ম লাভ করবে, তবে তোমরা দোয়ায় রত থাক যে, 'হে খোদা! আমাদের ও আমাদের বংশধরদের দুর্বলতা আর অনীহার ফলে এমনটি যেন না হয়ে যায় যে তোমার দৃষ্টিতে আমরা তাঁর যোগ্য না থাকি, আমাদের সাথে দেয়া ঐ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ না হয় বরং অন্য কোন জাতিতে ঐ নবী আবির্ভূত হয়ে যায়'। তাই বলেন তুমি আমার বংশধরদের মধ্য থেকে 'উম্মতে মুসলেমা' বানিও। প্রথম সম্বোধনেও রয়েছেন তিনি আর গোটা বিষয় কবুলকারীও তিনি নিজেই।

অতএব, এখানে বর্ণিত হয়েছে যে, সেই উম্মত যারা হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাইল (আ.)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে জন্ম লাভ করেছে– তারাই হল 'উম্মতে মুসলেমা'। ঐ নবীকে অস্বীকার করো না। ঐ নবীর প্রতি ঈমান এনো– যে সব দায়িত্ব তাঁর (সা.) কাঁধে ন্যস্ত হয় তা পালনের শক্তি সামর্থ্য ও যোগ্যতা তিনি রাখেন। আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে আমরা তাদেরকে এমনই জাতিরূপে গড়তে চাই আর এ উদ্দেশ্যেই আমরা পবিত্র কাবাগৃহ নবরূপে পুনর্নির্মাণ করিয়েছি।

একুশতম উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে **আরিনা মানাসিকানা**। এতে এ ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, সম্মানিত স্থান মক্কা থেকে এমন এক রসূল (স.) জন্ম লাভ করবেন যিনি জগতের বুকে ঐ যুগে আগমন করবেন যখন তিনি নিজের আধ্যাত্মিক ও দৈহিক পরিপোষণের পর এমন এক মর্যাদায় পৌঁছে যাবেন যে সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ শরীয়তের তিনি ধারকে পরিণত হবেন। এমন শরীয়ত যা পূর্ববর্তী ধর্মবিধানগুলোর তুলনায় অত্যুজ্জ্বল, সেই শরীয়ত এমনই যার মাঝে সময়োপযোগী আমল করার শিক্ষা দান করা হয়েছে এবং এমন শরীয়ত যা প্রত্যেক জাতির সর্বকালের প্রয়োজনসমূহ ও চাহিদাগুলোকে পূর্ণতা দানকারী। **আরিনা মানাসিকানা** আমাদের যুগোপযোগী যেসব কাজকর্ম, যেসব ইবাদত বন্দেগী আর যেসব দায়-দায়িত্ব রয়েছে সেসব আমাদের দেখিয়ে দাও আর শিখিয়ে দাও। অর্থাৎ কুরআনের শরীয়ত বিধি-বিধান আমাদের প্রতি অবতীর্ণ কর।

এভাবে **আরিনা মানাসিকানায়** এটা ব্যক্ত হয়েছে যে, ঐ রসূল যখন আসবেন বিশ্বের সকল জাতিসমূহের সাথে তার যোগাযোগ হবে আর তেমনিভাবে সর্বযুগের সাথেও যোগসূত্র হবে । অতএব দোয়ায় রত থাক– হে আমাদের 'রব্ব' বিভিন্ন জাতির চাহিদা ও আচার-আচরণে পার্থক্য রয়েছে, বিভিন্ন যুগের চাহিদাতেও তারতম্য রয়েছে, এসব দৃষ্টিপটে রেখে এমন পূর্ণাঙ্গীন ও পরিপূর্ণ শরীয়ত অবতীর্ণ কর যা সকল জাতির প্রকৃতিগত চাহিদাকে পূরণকারী হয় আর সর্বযুগের সমস্যা ও সঙ্কটের সমাধানকারী হয় এবং কিয়ামতকাল পর্যন্ত জীবিত থাকে, যাতে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কাবাগৃহের ভিত যে উদ্দেশ্যে রেখেছেন তা পূর্ণতা লাভ করে।

বাইশতম উদ্দেশ্য– আল্লাহ্ তা'লা ব্যক্ত করেছেন **ওয়াতুব্ আলাইনা**। এতে নির্দেশ করা হয়েছে, শেষ শরীয়ত যা এখানে অবতীর্ণ করা হবে তার খুবই গভীর সম্পর্ক হবে **রাব্বে তাওয়াব**-এর সাথে, আর ঐ শরীয়তের অনুসরণকারীরা গভীর সেই মর্ম শনাক্তকারী হবে যে, অনুশোচনা (তাওবা) ও ক্ষমা (মাগফিরাত) ছাড়া তত্ত্বজ্ঞান (মারেফাত) অর্জন সম্ভব নয়, এ জন্য সে বার বার তাঁর (আল্লাহ্‌র) পথে কুরবানীদাতা হতেই থাকবে আর বারে বারে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী হতে থাকবে সেই সাথে বলবে, হে খোদা! আমার ত্রুটিসমূহ ক্ষমা কর।

ঐ জাতি এমনই হবে, যারা পূণ্যকর্ম করার পরও ঐ বিষয়ে ভয় পেতে থাকবে যে, পূণ্যকর্মের কোনটা আমাদের বাদ পড়ে যায়নি তো! যার কারণে আমাদের 'রব্ব' আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হতে পারেন। তারা হবে ইস্তেগফার (অনুতাপ) ও তওবায় (অনুশোচনায়) সর্বক্ষণ নিমগ্ন এক জাতি ।

তেইশতম উদ্দেশ্য– আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন **রাব্বানা ওয়াব্‌আস ফিহিম রাসুলাম্ মিনহুম** অর্থাৎ আমরা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর জন্মভূমি ঐ স্থানকে নির্ধারণ করতে চাই, আমরা ঐ স্থানকে এমন মর্যাদা দিতে চাই যে, যার অভ্যন্তরে অনুনয় বিনয় ও কাকুতি মিনতির সাথে আর বিনম্র কোমলতার সাথে প্রেম-

প্রীতি ভালোবাসার সাথে কৃত দোয়ার ফলশ্রুতিতে আমরা স্বীয় এক দাসকে **মুহাম্মদীয়ত** (প্রশংসিত)-এর মর্যাদাবান অবস্থানে দন্ডায়মান করবো, আর তার মাধ্যমে এমন এক শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হবে আর এমন এক উম্মতের উদ্ভব ঘটানো হবে যারা নিজেদের মাঝে জীবন্ত নিদর্শন ধারণ করবে **ইয়াতলূ আলাইহিম আয়াতিকা** আর জিন্দা খোদার সাথে ও জীবন্ত রসূলের সাথে ও জীবিত শরীয়তের সাথে তাদের সম্পর্ক হবে। পূর্ণাঙ্গ শরীয়তের শিক্ষা তাদেরকে দান করা হবে, তবে অবুঝ শিশুদের যেভাবে বলা হয় তাদেরকে সেভাবে বলা হবে না যে, আমরা বলছি আর তোমরা মেনে নাও।

আল্লাহ্ তা'লা তাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও মেধাকে সতেজ করতে স্বীয় প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশাবলীও ঐ নবীর মাধ্যমে তাদেরকে জানাবেন আর এভাবে তাদেরকে এতটা পবিত্র করে দেয়া হবে যে সে ধরণের পবিত্রতালাভ পূর্ববর্তী কোন জাতির ক্ষেত্রেই ঘটে নি আর এটা এমন এক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যা আমাদেও জ্ঞানবুদ্ধিও সাগ্রহে মেনে নেয়। কেননা পূর্ববর্তী প্রায় সব উম্মতের প্রতি অসম্পূর্ণ শরীয়তের অবতরণ হয় আর সেই অপূর্ণ পথ-নির্দেশনার কারণে তাদেও আত্মশুদ্ধি যদি কিছু হয়েও থাকে তাহলে ঐ আত্মশুদ্ধিও পূর্ণাঙ্গীন নয়। তা ছিল তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী, যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও ক্ষমতা অনুযায়ী; তবে তা পূর্ণাঙ্গীন আত্মশুদ্ধিমূলক পর্যায়ের ছিল না।

যেহেতু যে শিক্ষা তাদের দেয়া হয়েছে তা পূর্ণাঙ্গীন নয় কেননা তাদের চেতনাবোধ ও সামর্থ্যও পূর্ণাঙ্গীন নয় সেই জন্য সেই জাতির উদ্ভব যখন হল যারা পূর্ণাঙ্গীন শরীয়তের ধারক হওয়ার সামর্থ্য রাখতো, তখন তাদের মধ্য থেকে যেসব লোকেরা অসাধারণ কুরবানীসমূহ পেশ করে খোদা তা'লার ভয় রেখে তাঁর যাবতীয় নির্দেশাবলী পালন করে ও সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে আত্মরক্ষা কওে তাঁর সমীপে কাকুতি মিনতির সাথে নিজ জীবন এমনভাবে অতিবাহিত করে যেন তার আত্মশুদ্ধি লাভ হয় (অবশ্য খোদা তা'লার অনুগ্রহের কারণেই এরূপ হয় নতুবা এটা তার আমলের ফল নয়), সেইটি হবে এক পূর্ণাঙ্গীন আত্মশুদ্ধি। তদ্রূপ এক পাকপবিত্রতাও লাভ হবে তার। আল্লাহ্ তা'লা তাতে এতটাই সম্মত ও সন্তুষ্ট হোন যে ঐরূপ সন্তুষ্টি পূর্ববর্তী জাতিসমূহ অর্জন করতে পারে নি।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা এখানে বলছেন, বায়তুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এক **খায়রুর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে** পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত করা আর পরবর্তীতে মানবজাতিকে মর্যাদার উচ্চস্তরে উন্নীত করে প্রতিষ্ঠিত করা, উন্নতির যে শিখরে দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি।

আল্লাহ্ তা'লার সমীপে আমাদের বিনীত দোয়া, তিনি আমাদেরকে সর্বদা নিজ অনুগ্রহে স্বীয় বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন। আমরা তো অত্যন্ত দুর্বল ও অযোগ্য আর অনিষ্টকারী ও পাপী এবং অবুঝ আর স্থুল বাসনা-কামনায় পরিবেষ্টিত হয়ে আছি, তবে তিনি যদি চান আর তাঁর অনুগ্রহ ও আশিস আমাদের প্রতি বর্ষিত হয় তাহলে সব রকমের নোংরামি ও মন্দ থেকে তিনি আমাদেও উদ্ধার করে পবিত্রতার ঐ উন্নত স্তরে পৌঁছাতে পারেন যার প্রতিশ্রুতি তিনি উম্মতে মুসলেমাকে দিয়েছেন।

পরবর্তী খুতবাগুলোতে ইনশাআল্লাহ্ আমি ঐ তেইশ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নবী করীম (স.)-এর মাধ্যমে কীভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে তার বিশদ বর্ণনা দিব। আমি ধীরে ধীরে আপনাদেরকে সেই বিষয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছি, যে সম্পর্কে আমি পূর্বেও ইঙ্গিত দিয়েছি যে মহান এক উদ্দেশ্যের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা আমার মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়েছেন আর সবাইকে একত্রিত করে সংশোধন করতে সেই কর্মসূচী বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ।

যাহোক, আমি চেষ্টা করছি আপনাদেরকে জ্ঞানগত ও মেধাগত দিক থেকে প্রস্তুত করতে। তবে আমি কে– আর আমার বলায় কীই-বা এলো গেল– যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে আমার কথাতে প্রভাব সৃষ্টি না করছেন আর আপনাদের অন্তরকে সেই কথার প্রভাব গ্রহণ করার সামর্থ্য দান না করছেন, এজন্য আপনারা দোয়ায় রত থাকুন।

আমিও দোয়া করছি, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অনুগ্রহ ও আশিসে আমাদের জামা'ত দ্বারা সেই কর্ম সাধন করান, যে মহান কর্ম সাধিত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা সেই পবিত্র গৃহ (কাবা) নির্মাণ করেছেন। (আমীন!)

(বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণের তেইশটি মহান উদ্দেশ্য পুস্তক থেকে উদ্ধৃত)

হজ্জ-গমণকারীদের জন্য দোয়ার আবেদন

ইসলাম ধর্মে হজ্জ একটি ফরয ইবাদত বা অবশ্য-পালনীয় অন্যতম মৌলিক বিষয়। প্রত্যেক সামর্থবানের জন্য এটি কমপক্ষে একবার করা ফরয। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মধ্যেও প্রতি বছর সামর্থবান অনেকে হজ্জ করে থাকেন। প্রতিবারের ন্যায় এবারও আমাদের অনেক নিষ্ঠাবান, ধর্মপ্রাণ ভাই-বোন মক্কা মুয়ায্যামায় হজ্জ করতে গিয়েছেন। কয়েকজনের নাম আমাদের হাতে এসেছে বিধায় তা উল্লেখ করে দিচ্ছি। তারা হলেন, মোহতরম মাহবুব হেসেন, মোহতরম শাহানশাহ আজাদ জুম্মান ও তার স্ত্রী, মরহুম আমজাদ খান চৌধুরী সাহেবের সহধর্মিণী প্রমুখগণ।

জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নি, যারাই এ বছর হজ্জ করতে গিয়েছেন বা যাচ্ছেন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদের এ ফরয আদায় নিজ অনুগ্রহে কবুল করে নেন আর এ হজ্জ-যাত্রা তাদের জন্য নিরাপদ ও স্বস্তিপূর্ণ এবং শান্তিময় হয়ে ওঠে, এজন্য সকলের নিকট হজ্জ-গমণকারীদের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে দোয়ার জন্য বিনীত আবেদন জানানো যাচ্ছে।

বিশ্বশান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(১৫তম কিস্তি)

নারী-অধিকারের নব যুগের সূচনা

এখানে আমরা আরবের ইতিহাসের সেই অন্ধকার যুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চাই, যে সময়টাতে ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছিল। আমরা মুসলমানরা বিশ্বাস করি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঐশী নির্দেশের অধীনে, যদিও মুসলমানরা মনে করে যে, ইসলাম মুহাম্মদের (সা.) নিজেরই শিক্ষা। এদের ধর্মবেত্তাদের অনেকের অভিমত যা-ই হোক না কেন, আসলে সত্য এটাই যে, নারী ও পুরুষের পৃথকীকরণের যে শিক্ষা ইসলাম দেয়, তা কোনক্রমেই আরব আচরণের প্রতিফলন নয়।

সে সময়ে নারীদের প্রতি আরবী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল চরমভাবে পরস্পর বিরোধ। এদিকে যৌনাচারের যথেচ্ছ অনুমতি নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং সুরা, নারী আর গানবাদ্যের উন্মুক্ত উৎসব, অপরদিকে কন্যা সন্তানের জন্মকে অমর্যাদাকর ও চরম লজ্জাস্কর মনে করা। এমনকি কোন কোন 'গর্বিত' এই কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচার জন্য তাদের সদ্য প্রসূত কন্যাকে নিজের হাতেই কবরে দিতে বলেও কথিত আছে। এটাই ছিল তখনকার আরবি সমাজের বৈশিষ্ট্য।

নারীদেরকে মনে করা হতো আস্থাবর সম্পত্তি। তাদের কোন অধিকার ছিল না যে, তার স্বামী, পিতা, ভ্রাতা বা পরিবারের অন্য কোন পুরুষ সদস্যের কোন বিরোধিতা করে। তবু, এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম ছিল। তখন এমনও দেখা যেত যে, নেতৃত্বের অসাধারণ গুণসম্পন্ন কোন মহিলা তার গোত্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

ইসলাম এ সমস্ত কিছুকেই পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। এবং তা করেছিল সামাজিক টানাপোড়েনের স্বাভাবিক অগ্রগামিতার ফলশ্রুতিরূপে। একটা সামাজিক ব্যবস্থা নির্দেশিত হয়েছিল উর্ধ্বে থেকে, যার সঙ্গে সমাজ পরিবর্তনের স্বাভাবিক শক্তিনিচয়ের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

পৃথকীকরণের শিক্ষার মাধ্যমে যৌন-অরাজকতা এক চোটেই বন্ধ করা গিয়েছিল। নারী পুরুষের সম্পর্কের নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছিল এবং তা হয়েছিল গভীর নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে। একই সঙ্গে নারীর মর্যাদা এতো উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছিল যে, তাদেরকে আর কোনভাবেই সাধারণ দ্রব্যসামগ্রীর মত অসাহায়রূপে গণ্য করা সম্ভব হতো না। তাদেরকে জীবনের কর্মক্ষেত্রে সমান অংশীদারিত্ব দেয়া হতো। অথচ ইতোপূর্বে তাদেরকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হতো আস্থাবর মালামালরূপে। এখন তারা নিজেরাই সম্পত্তির ওয়ারিশ শুধু পিতামাতারই নয়, স্বামীর ও সন্তানেরও এমনকি আত্মীয়েরও। তারা এখন তাদের স্বামীর সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। কথার জবাব দিতে পারে। তারা এখন তাদের যুক্তি পেশ করতে পারে। এবং অবশ্যই ভিন্নমতও পোষণ করতে পারে। তারা

যেমন তালাক পেতে পারে, তালাক দিতেও পারে।

ইসলামে নারীরা 'মা' হিসেবে এমন সুউচ্চ সম্মানে অধিষ্ঠিত যে, তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোনও সমাজে কখনই ছিল না, এখনও নেই। ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা (সা.) নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐশী-নির্দেশের আলোকে ঘোষণা দিয়ে গেছেনঃ

'মায়ের পায়ের তলায় বেহেশ্‌ত'

তিনি (সা.) এই অঙ্গীকার বাণী শুধু পরকালে মৃত্যুর পরেই, পূর্ণ হবে বলে বলেন নি; বরং তিনি এই বাণীতে এমন এক সামাজিক জান্নাতেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেখানে লোকেরা তাদের জননীদেরকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করবে, তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখবে এবং তাঁদের সুখ-সাচ্ছন্দ্য ও আরাম আয়েশের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। এবং,-

এই যে প্রেক্ষাপট, এরই নিরিখে বুঝতে হবে ইসলামের পৃথকীকরণের শিক্ষাকে। এটা কোন পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য করা হয়নি; বরং তা করা হয়েছে গৃহে পবিত্রতা প্রতিষ্ঠার জন্যে; স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অধিকতর আস্থা গড়ে তোলার জন্যে; মানবীয় মৌলিক কামনা-বাসনা মিতাচারী করার জন্যে; সেগুলোকে সংহত, নিয়মিত ও সুশৃংখল করার জন্যে; যাতে করে সেগুলোকে সমাজের মধ্যে শক্তিশালী দানবরূপে ছেড়ে না দিয়ে গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত রাখা যায়, এবং তা ঠিক সেভাবেই যেভাবে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ সদা কাজ করে চলে সদা প্রকৃতির মধ্যে।

পৃথকীকরণকে সম্পূর্ণরূপে ভুল বোঝা হয়েছে। মনে করা হয়েছে, এ ব্যবস্থার মাধ্যদে মুসলিম সমাজে নারী সম্প্রদায়ের উপরে এক প্রকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।যার ফলে, তারা মানবীয় কার্যাদিতে ইচ্ছেমত অংশগ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু, এই ধারণা ঠিক নয়।

পৃথকীকরণের ইসলামী ধারণাকে বুঝতে হলে তা বুঝতে হবে নারীদের সতীত্বের পবিত্রা রক্ষার্থে এবং সমাজে নারীদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে গৃহিত ব্যবস্থাদির প্রেক্ষাপটে, যার মাধ্যমে ঐ সব উদ্দেশ্য লংঘনের আশংকা তিরোহিত হয়।

নারী পুরুষের অবাদ মেলামেশাকে এবং নরনারীর মধ্যে চুপিসারে সংঘটিত সব (অশ্লীল) ক্রিয়াকলাপকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। নারী পুরুষ উভয়কে শুধু পরস্পরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিতে বারণ করা হয়নি, অধিকন্তু সকল প্রকারের দৈহিক সংস্পর্শ থেকেও বিরত থাকতে বলা হয়েছে, যাতে করে, অদম্য তাড়নার উদ্রেক ঘটতে না পারে। নারীদের এটাই তো প্রত্যাশিত যে, তারা শালীন ও সম্ভ্রমশীল পোষাক পরিধান করবে। তাদেরকে এই উপদেশও দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন এমনভাবে চলাফেরা না করে, যার দরুন রাস্তার লোকেরা তাদের উপরে কুদৃষ্টি দিতে না পারে। কস্‌মেটিক্‌স্ লাগাতে অলংকারাদি পরতে বারণ করা হয়নি; বরং যা করতে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে, ওর দ্বারা যেন পরপুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা না হয়।

আমরা খুব ভাল করেই বুঝি যে, সারা দুনিয়ার সমাগুলোর বর্তমান মনমানসিকতায় এই শিক্ষাকে বেশ কঠোর সীমাবদ্ধ এবং বিবর্ণ বা আকর্ষণহীন বলে মনে হবে। কিন্তু গোটা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রতি একটু গভীরভাবে দৃষ্টি দিলেই যে কেউ বলবেন যে, ঐ অভিমতটা হঠকারী এবং ভাসাভাসা। সুতরাং, এই শিক্ষাকে বুঝতে হবে গোট ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপেই।

ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থায় নারীরা যে ভূমিকা পালন করে, তা যেমন কোন হেরেমের উপপত্নীদের মত নয়, তেমনি তা এমন কোন গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দীত্বও নয়, যে গৃহে তাদের প্রগতি বাধাগ্রস্ত এবং যেখানে তারা জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত। তবে, ইসলামী সমাজব্যবস্থার যে কৎসিৎ চিত্র অংকিত হয়েছে, তার জন্য দায়ী ইসলামের ভেতরের এবং বাইরের দুষমনরাই, এবং সেই সঙ্গে এমন সব পণ্ডিতেরাও যারা ইসলামী জীবন-পদ্ধতিকে বুঝতে সম্পূর্ণ ভুল করেছেন।

একমাত্র বিষয় যা ইসলাম কখনই সমর্থন করবে না, তা হচ্ছে নারীদেরকে খেলার পুতুল পর্যবসিত করা, তাদেরকে যথেচ্ছ ব্যবহার করা অথবা পুরুষদের ইচ্ছ অভিরুচির কৃপার ওপরে ছেড়ে দেয়া। নারীদের প্রতি এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী পোষণের কোন অবকাশ নেই ইসলামে।

এটা নারীদের প্রতি স্রেফ একটা নিষ্ঠুরতা হবে যে, সমাজে সামগ্রিকভাবে চাহিদা বেড়ে চলেছে বিধায় নারীদের তা পুরণের জন্য সর্বদা তাদের চাউনী, চেহারা, পোশাক-আশাক ও রূপচর্চার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। নারী-সৌন্দর্য তো প্রদর্শিত হচ্ছেই। এমনকি, কোন খাদ্যদ্রব্য বা কোন দৈনন্দিন সামগ্রী যেমন সাবান, শ্যাম্পু ইত্যাদি বিক্রীর বিজ্ঞপনেও নারী মডেল না হলে চলে না। কৃত্রিম ষ্টাইল বা কেরদানী করা ও ব্যয়বহুল জীবন পদ্ধতিকে প্রয়োজনীয় করে তোলা হয়েছে তার স্বপ্ন পূরণের জন্য। কিন্তু এ ধরনের সমাজ কখনই ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পারে না, এবং তা কখনও মিতাচারী ও সুস্থ থাকতে পারে না।

ইসলামের মতে, নারীকে অবশ্যই যথেচ্ছ ব্যবহার করা এবং ভোগের সামগ্রীরূপে ভূমিকা পালন করা থেকে মুক্ত করতে হবে। তাদের হাতে অবশ্যই এমন যথেষ্ট সময় থাকতে হবে যাতে তারা তাদের গৃহের প্রতি যে দায়িত্ব এবং মানবজাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি যে দায়িত্ব তা পালন করতে পারে।

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর– ৬৯)

৮) পাপ দূরীকরণ এবং ঐশী-সাহায্য প্রাপ্তির জন্য নামায অত্যাবশ্যক ঃ

আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের উদ্দেশ্যে হযরত আহমদ (আ.) বলেন, "মোটকথা, সেই অন্তঃকরণ যা পাপে পরিপূর্ণ এবং আল্লাহর তত্ত্বজ্ঞান ও নৈকট্য হতে দূরে পড়ে আছে, তাকে পবিত্র করার এবং দূর হতে নিকটে আনার জন্যই নামায। নামায দ্বারা পাপের দূরীকরণ হয় ও অশুভ মনোবৃত্তিগুলির স্থলে শুভ ও পবিত্র মনোবৃত্তিসমূহ দ্বারা হৃদয়কে পরিপূর্ণ করা হয়। এই গূঢ় তত্ত্বই কুরআনের (২৯ঃ৪৬) আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'নামায সর্বপ্রকার পাপকে দূর করে। নামায 'ফাহ্‌শা'(ব্যক্তিগত ত্রুটি) ও মুনকার (সমাজগত দোষনীয় বিষয়) হতে বিরত রাখে।" (মলফূযাত, ১ম খণ্ড)।

"তোমরা পবিত্র হইতে চেষ্টা কর, কেননা মানুষ পবিত্র সত্তাকে তখনই লাভ করিতে পারে যখন সে নিজে পবিত্র হয়, কিন্তু তোমরা কিরূপে এই নেয়ামত লাভ করিতে পার। স্বয়ং খোদা তা'লাই ইহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি কুরআন শরীফে (২ঃ৪৬) আয়াতে বলিয়াছেনঃ "নামায ও অধ্যাবসায় সহকারে খোদা তা'লার সাহায্য প্রার্থনা কর"। নামায কি? ইহা হইল দোয়া, যাহা 'তসবীহ্' (মহিমাকীর্তন), 'তাহমীদ' (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন), 'তকদীস' (পবিত্রতা ঘোষণা) এবং 'ইস্তেগফার' (নিজের দুর্বলতা স্বীকার করিয়া শক্তি প্রার্থনা) ও 'দরূদ' (হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি আশিস কামনা) প্রেরণের মাধ্যমে সবিনয়ে প্রার্থনা করা হয়। সুতরাং যখন তোমরা নামায পড় তখন দোয়ার মধ্যে অজ্ঞ লোকদের ন্যায় শুধু আরবী শব্দ ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ থাকিওনা। কারণ তাহাদের নামায এবং ইস্তেগফার সবই বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ মাত্র যাহাতে কোন সারবস্তু নাই। কিন্তু তোমরা যখন নামায পড় তখন খোদা তা'লার কালাম কুরআন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কালামে বর্ণিত অন্যান্য কতিপয় দোয়া ছাড়াও নিজেদের যাবতীয় সাধারণ দোয়া নিজেদের ভাষাতেই কর। নিবেদন জানাও যেন সেই সকাতর নিবেদনের সুপ্রভাব তোমাদের হৃদয়ে পতিত হয়।" (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ৮৪)

৯) সফলতা ও মুক্তি লাভের জন্য বিশ্বাসী সদস্যদের প্রতি উদাত্ত আহবানঃ

আহমদীয়া সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আহমদ (আ.) বলেন, "সুতরাং তোমরা সাবধান হও এবং খোদার শিক্ষা এবং কুরআনের হেদায়াতের বিরুদ্ধে এক পা-ও অগ্রসর হয়ো না। আমি সত্য সত্যই বলছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাতশ আদেশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করেছে এবং অবশিষ্ট সব গ্রন্থই ইহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল। সুতরাং তোমরা কুরআন শরীফকে গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ কর এবং এর সাথে এরূপ প্রণয় ও অনুরাগের সম্বন্ধ স্থাপন কর, যেরূপ প্রণয় বা অনুরাগের সম্বন্ধ অন্য কারও সঙ্গে কর নি। কারণ খোদা তা'লা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, 'আলখায়রু কুল্লুহু ফিল কুরআন' অর্থাৎ সর্বপ্রকার মঙ্গল কুরআন শরীফেই নিহিত আছে। এ কথাই সত্য। ধিক্ ঐসব ব্যক্তিকে, যারা কুরআন শরীফের উপর অন্য কোন বস্তুকে স্থান দেয়। তোমাদের সমস্ত সফলতা ও মুক্তির উৎস কুরআন শরীফে আছে। তোমাদের এরূপ কোন ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় বিষয় নেই যা কুরআন শরীফে নেই। 'কেয়ামতের' দিন তোমাদের ঈমানের সত্যায়নের মানদণ্ড একমাত্র কুরআন শরীফ ইহবে।" (আমাদের শিক্ষা, পৃ: ২০)।

বিভ্রান্তিমূলক অপ-প্রচার বন্ধের জন্য আহবান

আহমদীয়া মুসলিম ফিরকা বা জামাত (ধর্মীয় সংগঠন) সম্বন্ধে কতিপয় উগ্রপন্থী আলেম–উলামা এবং মোল্লাশ্রেণীভূক্ত লোকেরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে বিশেষতঃ ধর্মীয় সূক্ষ্ম বিষয়াবলী গভীরভাবে না বুঝার কারণে ফতোয়াবাজীসহ নানা প্রকার বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা এবং গল্প–গুজব রটনা করে আসছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা ঐশী নির্দেশে চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৩০৬ হিজরী) মাহদী ও মসীহ হওয়ার দাবী করেছেন। পবিত্র কুরআন ও হাদীস এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থাবলীতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর

আলোকে তিনি তার দাবীর সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য আহবান জানিয়েছেন। তিনি উগ্রপন্থী আলেমদের ধ্যান–ধারণা অনুযায়ী তথাকথিত খুনী-মাহদী অথবা চতুর্থ আকাশ থেকে সশরীরে মর্তে আগমনকারী ঈসা মসীহ হওয়ার দাবী করেন নাই। পক্ষান্তরে তাঁর দাবীর মূল ভিত্তি হিসেবে তিনি ইসলামের শান্তি এবং মানবতাবাদী শিক্ষার আলোকে, যুক্তিজ্ঞান এবং ঐশী-নিদর্শনাবলীর দ্বারা ইসলামের ছায়াতলে বিশ্ববাসীকে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি ও উৎকর্ষতা অর্জনের মাধ্যমে একত্রিত করার জন্য অস্ত্রের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণভাবে আদর্শিক সংগ্রাম এবং কলমের জিহাদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। তাঁর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া সংগঠন বিগত শতাধিক বছর যাবৎ আল্লাহ তা'লার বিশেষ সাহায্য ও সমর্থনে বর্তমানে (২০১৭ সনে) দুই শতাধিক দেশের প্রচারকেন্দ্র থেকে শান্তিপূর্ণভাবে প্রচারকার্য পরিচালনা করে যাচ্ছে বিরুদ্ধবাদীদের ফতোয়াবাজীসহ সর্ব প্রকার বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুযায়ী সত্যের দ্বারাই সত্যের বিজয় হবে পক্ষান্তরে মিথ্যা দ্বারা কখনই সত্যের বিজয় হতে পারে না এবং হবেও না। যারা ধর্মের নামে মিথ্যাচার করছে তাঁরা বোকার স্বর্গেই বাস করছে। এখানে উল্লেখ না করে পারছি না যে, বিরুদ্ধবাদীগণের মধ্যে কোন কোন সীমালঙ্ঘনকারী নিতান্ত হীনমন্যতার পরিচয় দিয়ে আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে এমন সব অতিরঞ্জিত প্রপাগান্ডা এবং ভ্রান্ত-ধারণা ছড়াচ্ছে যে, কোন সুস্থ-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং শিক্ষিত ব্যক্তির মাথায় কখনই এরূপ পদ্ধতি (বিশেষতঃ ধর্মীয় ব্যাপারে) কখনই আসতে পারে বলে মনে হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রায়শই কোন কোন বিরুদ্ধবাদী কিছু কিছু প্রচারপত্র এবং পুস্তকের মাধ্যমে এমন সব কথা বলেন এবং আহমদীয়া সাহিত্যের কিছু রেফারেন্স উল্লেখ করেন যেগুলোর মূলতঃ হয় কোন অস্তিত্বই নাই, অথবা সেগুলি উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃত এবং প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এই ধরনের কতগুলো আপত্তির জবাবে নীতিগতভাবে আহমদীয়া জামাতের সুস্পষ্ট শিক্ষা এবং অবস্থান কি তার প্রতি সকলের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ফলতঃ এরূপ স্পষ্টীকরণের পর আশা করি বিরুদ্ধবাদীদের সকল অপপ্রচারমূলক আস্ফালন বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাদের কথায় সরল-সহজ জনগণ কখনই বিভ্রান্ত হবেন না। নিচে এরূপ কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে বিস্তারিত জানার জন্য হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আ.) প্রণীত ৮৮ খানা পুস্তক, অন্যান্য আহমদীয়া সাহিত্য, পত্র-পত্রিকা, এম.টি.এ নামক টেলিভিশন, এবং অনেকগুলো ওয়েবসাইট যেমন www.alislam.org এবং www.ahmadiyyabangla.org এবং www.mta.tv এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং প্রচার মাধ্যমের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(১)ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের উপর আকিদা বা ধর্ম–বিশ্বাস এবং আহমদীয়া জামাতঃ

বিরুদ্ধবাদীদের একটি বহুল প্রচারিত ভ্রান্ত ধারণা সুস্পষ্টরূপে দূর করে দেওয়ার জন্য উল্লেখ করছি যে, বিরুদ্ধবাদীদের যে সকল প্রচারণায় বলা হয়েছে যে, আহমদীগণ 'কলেমা তৈয়ব' মানে না, অথবা তারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায, যাকাত, রোজা ও হজ্জ পালন করে না, সেই সকল প্রচারণা সর্বৈব মিথ্যা। অনেকে বলে বেড়ান যে, আহমদীরা আল্লাহকে মানে না, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানে না, পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও হাদীস মানে না, ইত্যাদি। এই সকল কথা শুধু নির্জলা মিথ্যাই নয়, নিতান্তই মিথ্যার বেসাতী-ব্যবসা ছাড়া অন্য কোন নামে অভিহিত হতে পারে না। আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে, আহমদীগণ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে 'খাতামান নবীয়্যীন' রূপে মান্য করে না। প্রকৃতপক্ষে ইহাও একটি বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা মাত্র। কেননা আহমদীগণ পবিত্র কুরআন মানে এবং সেই কুরআনে যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সা.)–কে 'খাতামান নবীয়্যীন' বলে আল্লাহ তা'লা অভিহিত করেছেন (সূরা আহযাব: ৫ম রুকু) তাই তারা তাঁকে 'খাতামান নবীয়্যীন' বলে অবশ্য অবশ্যই মান্য করে। আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং ঘোষণা করেছেন,

(ক) "যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম–বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদা তা'লা ব্যতিত অন্য কোন মাবুদ বা উপাস্য নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'লা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে যা বর্ণিত হয়েছে উল্লেখিত বর্ণনা অনুসারে তা যাবতীয় সত্য।" (আইয়ামুস সুলেহ, পৃ: ৮৬)।

(খ) "আমরা মুসলমান। আমরা এক ও অদ্বিতীয় খোদার উপর ঈমান রাখি এবং 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' কলেমার বিশ্বাসী এবং খোদা তা'লার কিতাব কুরআন করীম এবং তাঁর রসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে খাতামান নবীয়্যীন বলে মানি।" (নুরুল হক পুস্তক, খন্ড: ১, পৃ: ৫)।

(গ) "আমি দৃঢ় বিশ্বাস এবং দাবীর সাথে বলছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের উপর নবুওয়তের 'কামালাত' বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী শেষ বা চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়েছে। সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারী যে তাঁর বিরোধী আলাদা কোন সিলসিলা বা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে এবং মুহাম্মদী নবুওয়াত হতে পৃথক হয়ে আলাদা কোন তত্ত্ব পেশ করে এবং মুহাম্মদী নবুওয়তের উৎসকে ত্যাগ করে। আমি খোলাখুলিভাবে বলছি যে, সে ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে ছেড়ে তারপরে অন্য কাউকে নবী বলে বিশ্বাস করে এবং তাঁর 'খতমে নবুওয়ত'-কে ভঙ্গ করে। এ কারণেই, এরূপ কোন নবী আসতে পারে না যার নিকট মুহাম্মদী নবুওয়তের মোহর না থাকে।" (আল–হাকাম: ১০জুন, ১৯০৫ইং)।

(চলবে)

আমি কিভাবে আহমদী হলাম

মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান (সিদ্দীকী)
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

(৫ম কিস্তি)

লাহোরের শাহী কেল্লায় সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন সেল এ বন্দীদের রাখা হয়। সেই ছোট্ট ঘরেই সব কিছু করতে হত। সেই ঘর থেকে বের হওয়ার কোনক্রমেই অনুমতি ছিল না, খাওয়া-দাওয়া, গোসল ইত্যাদি সব সেই ঘরেই করতে হত। এমনকি প্রস্রাব-পায়খানা পর্যন্ত সেই ছোট্ট কুঠুরিতেই করতে হত। শুধুমাত্র এক জোড়া কাপড় ব্যবহারের অনুমতি ছিল। ছোট্ট একটি ঘর আর দুর্গন্ধ, এর ফলে স্বাস্থ্য অনেক খারাপ হচ্ছিল। এই জায়গাতেই কখনো আমি শুয়ে যেতাম কখনো উঠে বসতাম আবার কখনো ঘরের ভেতর পায়চারী শুরু করতাম। আবার কখনো নফল নামায ইত্যাদি পড়া শুরু করতাম। অদ্ভুত সব উদ্বেগের জন্ম হত। এক মুহূর্তও স্বস্তি ছিল না। এখানে কারো সাথে আমার না কোন পরিচয় ছিল, না চেনা জানা ছিল। শেষমেশ খোদাতা'লা আমার ও আমার সেই বন্ধুদের (অর্থাৎ দেয়ালের) দোয়া শুনলেন। ১১ই নভেম্বর আমাদের মুশফিক ও দয়াবান শিক্ষক কুরায়শি নুরুল হক সাহেব তানভীর হাইকোর্ট এর অনুমতি নিয়ে আমার সাথে দেখা করতে কেল্লায় আসলেন। তাঁকে দেখে যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। এতদিন পরে একজন পরিচিত তাও আবার আমাদের শিক্ষক আমাকে দেখতে এসেছেন। খুশির চোটে মুখ দিয়ে শব্দ বের হচ্ছিল না। মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলাম। অনেক কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু হয়তো মুখে তালা লেগে গিয়েছিল। পরে তানভীর সাহেবও চলে গেলেন আর আবার সেই বদ্ধ ঘর, নির্দোষ নির্বিকার দেয়াল আর আমি। রাতভর চিন্তা করতে লাগলাম হঠাৎ করে তানভীর সাহেব কিভাবে এখানে আসলেন... উনি কিভাবে আমার সাথে দেখা করার অনুমতি পেলেন! ইত্যাদি... তারপর ১২ই নভেম্বর আমাকে কেল্লা থেকে হাইকোর্ট নিয়ে যাওয়া হল। আর এভাবেই জীবনে প্রথমবারের মত হাইকোর্ট দেখলাম (যদিও আসামী হিসেবে)। সেখানে জজ সাহেব কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আবার কেল্লায় ফেরত আনা হল আমাকে। এরপর অনেকটাই নিশ্চিন্ত হলাম যে, ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই ছাড়া পাব।

তারপর ১৮ই নভেম্বর সন্ধ্যা আমার জন্য বেকসুর খালাসের সুসংবাদ নিয়ে আসল। হাইকোর্ট আমার বেকসুর খালাসের রায় দিয়েছিলেন। সেই সন্ধ্যাতেই মোহতরম এডভোকেট সরফরাজ সাহেব এবং মোহতরম তানভীর সাহেব আমাকে কেল্লা থেকে নিয়ে গেলেন। এডভোকেট সরফরাজ সাহেব, চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান (রা.)-এর ভাতিজি জামাই ছিলেন। তিনি বললেন, সকাল থেকে সারাদিন তিনি শুধু চা বিস্কুট ছাড়া কিছু খাননি। আমাকে আজই জেল থেকে বের করে এরপর খাবেন। কেল্লা থেকে বেরিয়ে সোজা সিজান হোটেলে গিয়ে আমরা রাতের খাবার খেলাম। তারপর লাহোরের আমীর চৌধুরী হামিদ নাসরুল্লাহ সাহেবের বাসায় গেলাম। সেখানে পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের সাবেক চীফ অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল জাফর আহমদ চৌধুরী সাহেবের সাথে দেখা হল। সম্পর্কে তিনি চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান (রা:) এর ভাতিজা ছিলেন। তারপর সেই রাত লাহোরের জামাতী গেস্ট হাউস দারুয যিকিরে কাটালাম। ২৭ দিনের বন্দীদশার কষ্ট সহ্য করার পর সেই রাতটি ছিল স্বাধীনতার প্রথম রাত। মনের অদ্ভুত অবস্থা ছিল। আনন্দের আতিসহ্যে সারারাত ঘুমই আসল না। বারবার আল্লাহতা'লার হামদ ও শুকুর করছিলাম। ১৯ই নভেম্বর বিকেলে রেলকার ট্রেনযোগে লাহোর থেকে রওনা হলাম আর রাত আটটার দিকে রাবওয়াহ স্টেশনে পৌঁছলাম। বিপুল সংখ্যক মানুষ আমাকে স্বাগত জানাতে স্টেশনে এসেছিলেন। স্টেশন লোকে লোকারণ্য ছিল। সবাই আমাকে দেখতে চাচ্ছিলেন। মির্যা মোহাম্মদ আফজাল খান (পাঠান) সাহেব আমাকে তাঁর কাঁধের উপর তুলে নিয়ে নাচতে লাগলেন... এরপর সেখান থেকে সাইয়্যেদনা হযরত আকদাস এর খেদমতে হাজির হলাম। তখন রাত ১০টা বাজে। হুযুর (রাহে:) খুবই ব্যস্ত ছিলেন, বললেন পরদিন সকাল ১০টায় দেখা করবেন। রাবওয়াহ বাসী এমন ভালবাসা প্রদর্শন করল যা আজীবন স্মরণ থাকবে।

বন্দীদশার কষ্ট

বন্দীত্ব যেমনই হোক বন্দিত্বই হয়। সেখানে স্বাধীনতা বা সুযোগ সুবিধার প্রশ্নই আসে না। আর বিশেষ করে আমাদের মত দেশে যেখানে বন্দীদের সাথে যা ব্যবহার করা হয় তা আর বলার মত নয়... আল্লাহ রহম করুন।। আমি সংক্ষেপে সেসব কষ্টের বর্ণনা করে দিচ্ছি যা বন্দী অবস্থায় আমার জন্য প্রচন্ড কষ্ট, ভয় ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল

মির্যা মোহাম্মদ আফজাল খান, মুরব্বী সিলসিলাহ্ কানাডা

এবং সেখানে আমাকে অনেক কষ্ট দেয়া হয়েছিল।

লালিয়া থানায় আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ কোন কষ্ট দেয়া হয়নি। শুধুমাত্র প্রস্রাব-পায়খানার জন্য সকাল সন্ধ্যা দুবার ঘর থেকে বের হওয়ার সুযোগ হত। এছাড়া অন্য কোন সময় পায়খানা প্রস্রাবের জন্যও হাজতীদের হাজত ঘর থেকে বের হওয়ার কোন অনুমতি ছিল না। সেখানে যখন কোন কয়েদীকে পুলিশ অত্যন্ত নির্দয় ও নিষ্ঠুর ভাবে মারতো সেটা দেখা আমার জন্য সবচেয়ে কষ্টকর বিষয় ছিল। আর তাদের বেদনাদায়ক ও মর্মস্পর্শী চিৎকারে আমার হৃদয় কেঁপে উঠত। এই ভয়াবহ দৃশ্য আমার সহ্য হত না। আর এর প্রভাব এতটাই বেশী ছিল যে আমার জ্বরও এসে গিয়েছিল।

চিনিউট হাজতখানায় সাতদিন ছিলাম। এখানেও অদ্ভুত দৃশ্য ছিল। ছোট্ট একটি ঘর, জায়গা খুব কম আর অনেকজন মানুষ। সবাই এক সময় আরামও করতে পারতাম না, আবার সেই একই ঘরে গোসল, প্রস্রাব-পায়খানা ইত্যাদি করতে হত। লোকজন খাওয়া দাওয়াও এই একই ঘরে করত। ঘুমাতে গেলে একজনের শরীরের সাথে আরেকজনের শরীর লেগে যেত। আমার জন্য খাবার কোন আহমদী বাড়ি থেকে নিয়ে আসা হত। সিগারেট আর হুক্কার ধোঁয়ায় বিদঘুটে গন্ধে ঘর ভরে যেত। কিন্তু আমরা নিরুপায় । সেখানেই এক সপ্তাহ থাকতে হল।

কেল্লায় সকালের নাস্তায় একা কাপ চা আর একটি বিস্কুট দিত। আর সকাল ৯টার দিকে ডাল আর রুটি দিত, রাতেও একই ব্যবস্থা। বিকেল ৫টার দিকে চা দিত। তরকারি যা দিত তা বহু কষ্টেই খাওয়া যেত, নেহায়েত বিস্বাদ আর বদমজা হত। রাতের বাসি তরকারি সকালে দেয়া হত। এখানে শুধুমাত্র এক জোড়া কাপড় রাখার অনুমতি ছিল। যার ফলে একখানা নোংরা কাপড়ই ভীষণ কষ্ট করে পরে থাকতে হত আর কাপড় ধোয়া বা শুকানোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। অনেক কষ্টে দু'বার কাপড় ধুয়েছিলাম।

কর্তৃপক্ষের 'সম্মানজনক' আচরণ

কয়েদীদের সাথে সাধারণত অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করা হয় আর খুবই জঘন্য নোংরা ভাষায় তাদের সম্বোধন করা হয় আর নোংরা গালিও দেয়া হয়। একজন ভদ্রলোকের পক্ষে তো তা ভাষায় বর্ণনা করার মতো না, বর্ণনা তো দূরে থাক সেসব গালি শোনাই তার জন্য খুবই কঠিন। এমন ব্যবহার যা অন্যান্য কয়েদীদের সাথে হয়ে থাকে তা আমার সাথেও হল। জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। ভয় দেখান হল, হুমকি দেয়া হল। এটাও বলা হল যে, তোমাকে মেরে ফেলা আমাদের জন্য কোন ব্যাপার না, কেউ জিজ্ঞেসও করবে না। তাদের স্বভাবসুলভ গালাগালি, নোংরা ভাষায় আমাকে সম্বোধন চলতে থাকল। যে ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতো তার চেহারাও খুবই ভয়ঙ্কর ছিল। যখন আমি তার সব প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতাম তখন বলত 'না! তুমি কিছু গোপন করছ'। মোটকথা একটি কথার সূত্র ধরে অবশেষে আমার উপর অত্যাচার নির্যাতন শুরু করে দিত। তারা যে নোংরা গালাগাল করত তার উদাহরণ পাওয়া যাবে না। অন্তত আমি এর আগে কখনো এমন নোংরা ভাষা শুনিনি। আমার ভাগ্য ভাল ছিল, পাঞ্জাবী ভাষার গালি বুঝতাম না। মুক্তি পাওয়ার পর আমার বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করেছিল, দু'একটি গালি শোনালাম যার অর্থ জানতাম না। বন্ধুরা আমাকে বলল এর অর্থ তোমাকে বলা যাবে না। আর এরকম নোংরা গালাগালের মাঝেই আমি জামাতে আহমদিয়া সম্পর্কে ভাল ভাল কথা শোনাতে থাকলাম। আমার চেয়ে আমার ধর্মবিশ্বাসকে বেশী গালমন্দ করতে থাকল। আসলে তারা চাইছিল আমি আহমদিয়াত ছেড়ে দেই আর তার চেয়েও বেশী চাইছিল যেন আমি জামাতের বিরুদ্ধে কোন বয়ান দেই তাহলে তারা জামাতকে আইনের আওতায় আনতে পারবে। এমনকি পরিষ্কার ভাষায় বলল, যদি আমি আহমদিয়াত ছেড়ে দেই তাহলে আমাকে শাহী মসজিদে নিয়ে গিয়ে এলান করিয়ে দেবে, গলায় মালা পড়াবে, ভাল বিয়ে শাদী করিয়ে দেবে, ভাল চাকরিও দেবে ইত্যাদি। বিভিন্ন অপমানজনক কাজ করাত। যেমন উঠে দাঁড়ানো, বসে যাওয়া, কানে ধরা... ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এরপর মারধর শুরু করে দিত। তখন আমি মানসিকভাবে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়তাম। কিছু অনুভব করতে পারতাম না। শুধু এটুকু মনে আছে যে তারা হাত দিয়েও মারত, লাঠি দিয়েও মারত, পা দিয়েও লাথি দিতে থাকত। এটাও মনে পড়ে যে, মারতে মারতে লাঠিও ভেঙ্গে ফেলেছিল। এছাড়া বিভিন্ন অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখত। অতঃপর একদিন তারা যুলম অত্যাচারের মাত্রা অনেক বাড়িয়ে দিল। এমন সময় খোদার রহমত বর্ষিত হল আর তাঁর কুদরত দেখুন, তাদের মধ্যে একজনের পেটে ব্যথা উঠল, সে বাহিরে চলে গেল। তার ফেরত আসা পর্যন্ত অনেকটা সময় অতিবাহিত হলো, শেষমেশ ক্লান্ত হয়ে অবশেষে তারা জঘন্য অত্যাচার নির্যাতনের ইতি টানল। (খোদা তাদের প্রতি দয়া করুন)

কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক, কিন্তু এটা

মাঝে বসা কোরাইশী নুরুল হক তানভীর, হোস্টেল সুপারিটেণ্ডেন্ট।
লেখক পেছনে দাঁড়ানো ডান থেকে দ্বিতীয়।

সত্যি যে তারা যেসব মারধর করত তাতে আমার শারীরিক কোন ব্যথা অনুভব হত না তবে হ্যাঁ, মানসিক ভাবে খুবই কষ্ট হত।

একবার আটটার দিকে ডেকে নিয়ে গেল। আমার পায়ে দড়ি বেঁধে ঘরের ছাদের সাথে রাতভর ঝুলিয়ে রাখা হবে। কিন্তু কুদরতের এমনটি ইচ্ছা ছিল না। হঠাৎই সেসময় তাদের বড় কর্মকর্তার কাছ থেকে নির্দেশ আসল আমাকে তার সামনে হাজির করতে। তখন আমাকে সেই বড় কর্মকর্তার কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি আড়ম্বরপূর্ণ অদ্ভুত পদ্ধতি নিলেন। আমার সাথে অনেক সহানুভূতি প্রদর্শন শুরু করলেন আর বললেন ভাই, আমরা তোমার সাথে অনেক ভাল ব্যবহার করব তুমি শুধু সত্যি কথা বল। নাহলে...

তারপর কাগজ কলম দিল যে লিখিত বয়ান দাও। আমি জামাতের নেযাম ও কার্যক্রম সম্পর্কে লিখেছিলাম। এরপর আর শারীরিক অত্যাচার করা হয়নি। জেল থেকে বেরিয়ে শুনেছিলাম একজন আহমদী পুলিশ অফিসার, ডি.এস.পি. মাসুদ সাহেব আমার জেলের ডি.এস.পি. সাহেবের পরিচিত ছিলেন। তিনি ফোন করে আমার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। আমাদের জেলের ইনচার্জ ডি.এস.পি. কে বলেছিলেন,"তুমি জান আমি কখনও ঘুষ খাই না, কোন অন্যায় সমর্থন করি না। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি এই নওজোয়ান নির্দোষ, বয়সও কম। তার উপর অত্যাচার করোনা।" ডি.এস.পি মাসুদ সাহেব পরবর্তিতে আমার সাথে দেখা করেছিলেন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার

গ্রেফতার হবার পর পুরো সময় জুড়ে আল্লাহতা'লার এই বিশেষ ফযল আমার সাথে ছিল যে, যেই আমার কাছাকাছি হয়েছে আমার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ)। আমি মনে করি এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখি যে, এর মধ্যে আমার কোন বিশেষত্ব ছিল না বরং শুধুমাত্র ইসলাম ও আহমদীয়াতের বরকতেরই ফলাফল ছিল। লালিয়া থানা, চিনিউট হাজতখানা সব জায়গায় আমার দ্বারা অনেক মানুষ প্রভাবিত হয়েছে। কোন পুলিশ অফিসার বলেছেন, 'তোমার সাথে জুলুম হচ্ছে কিন্তু আমরা নিরুপায়।' আমার জন্য ভাল খাবারের ব্যবস্থা করত। একবার তো একজন সিপাহী তার নিজের রান্না করা খাবার এনে আমাকে খাইয়েছে। কেউ কেউ বলেছে, 'তুমি মুখে বলছ মির্যায়ী, তাদের আশ্রয় থাক বলে। তুমি জান যে তারা তোমাকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করবে। হয়ত তুমি আসলে অন্তর থেকে মুসলমান।' আল্লাহর অশেষ কৃপা, কঠিন নির্যাতন সহ্য করেছি, কিন্তু আহমদীয়াতের সম্পর্কে মন্দ কথা বলিনি। পাঞ্জাবীরা বড় জাহেল হয়। তারা বলেছে কেবল মির্যা সাহেবকে গালি দাও (হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে) আমরা তোমার সাথে ভাল ব্যবহার করব। লাহোরে আমাকে প্রায় পাঁচবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির করা হয়েছিল। কখনও কখনও বিশেষ পার্টির কাছেও সোপর্দ করা হত। বিশেষ দলে বা সাধারণ দলের মধ্যে কেউ কেউ সবচেয়ে অমানবিক আচরণ করত। তাদের ভাষা অত্যন্ত খারাপ ছিল।

একবার জিজ্ঞাসাবাদের সময় আমাকে চেয়ারে বসাল, অথচ সবসময় আমাকে মাটিতে বসাত বা দাঁড় করিয়ে রাখত। আর চা-ও খাওয়াল।

একবার এক অফিসার যিনি আমাদের ঘর পরিষ্কার করাচ্ছিলেন, একজন সাব-ইন্সপেক্টর তার সাথে হাঁটতে হাঁটতে আমার কাছে এসে গেলেন। সাব-ইন্সপেক্টর আমার দাড়ি আর বালিশ দেখে অফিসারকে জিজ্ঞেস করতে গেলেন 'এ কী দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী?' অফিসার বললেন যে 'এ তো ছাত্র'। সেই সাব-ইন্সপেক্টর বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'ছাত্র এখানে কোথা থেকে আসল!' সাব-ইন্সপেক্টর তখন শক্ত ভাষায় বলতে লাগল 'পাকিস্তানে ন্যায়বিচার কোথায়? মানবতা তো একেবারেই নেই। মীর্যায়ী হওয়ার জন্য একজন নিরপরাধ ভিনদেশী ছাত্র এভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এখানে কে কাকে জিজ্ঞেস করবে?

একবার আমি আমার কামরায় পাখিদের জন্য বসে বসে রুটি টুকরো করছিলাম। একজন সাহেব আসলেন আর কিছুক্ষন আমাকে পর্যবেক্ষণ করলেন, হঠাৎ বলে উঠলেন কে বলে যে এ অমুসলিম! অমুসলিম কখনও এমন হতে পারে না! অথচ এই সাহেব একবার প্রশ্নোত্তরের সময় একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সহকারী হিসেবে ছিলেন আর সেসময় তিনিও আহমদিয়াতের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন। কিন্তু আজ বলছেন এই লোক অমুসলিম কিভাবে হতে পারে?

একবার আমি রাতের খাবার খাচ্ছিলাম তখন ডিএসপি সাহেব এলেন। আমি আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখলাম ডিএসপি সাহেব হাত মেলানোর জন্য আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আমিও তখন হাত বাড়িয়ে হাত মেলালাম। একজন কয়েদির সাথে কখনই এমন ব্যবহার করা হয় না। ডিএসপি সাহেব আমার অবস্থাদি জিজ্ঞেস করলেন আর আমাকে আশ্বাস দিলেন।

(চলবে)

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর বিশ্বময় শান্তি ও ন্যায়বিচারের বার্তা প্রদানের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্যের ৫১তম সালানা জলসার সমাপ্তি

"১১৪টি দেশ থেকে ধর্মপ্রাণ মুসলমানসহ বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের ৩৭ হাজারের অধিক ব্যক্তিবর্গের প্রীতিময় সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে অংশগ্রহণ"

মহান খোদা তা'লার অশেষ কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্যের ৫১তম সালানা জলসা গত ২৮, ২৯ ও ৩০ জুলাই, ২০১৭ লন্ডনের অল্টনস্থ হাদীকাতুল মাহদীতে সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রাণ-প্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) জলসার প্রথম দিন অনুষ্ঠান শুরুর প্রাক্কালে শুক্রবারের জুমুআর খুতবায় জলসার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আগত মেহমানগণের সেবায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্বের বিষয়ে সচেতন করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, এই দিনগুলোতে দোয়ার ওপর অনেক বেশি জোর দিন এবং যাদের সামর্থ্য রয়েছে তারা সদকাও করুন, যেন আল্লাহ্ তা'লা জলসাকে সব দিক থেকে সফল ও কল্যাণমণ্ডিত করেন। আর যারা এখানে জলসায় এসেছেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী আহমদীরা, যারা এম.টি.এ-এর মাধ্যমে এই সম্প্রচার শুনছেন, জলসার সফলতারর জন্য এবং শত্রুদের সব ধরণের ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রত্যেকে সার্বিকভাবে দোয়া করুন। খুতবার শেষ দিকে হুযূর (আই.) আবারো সকলকে দোয়ার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ সময় রাত ৯:২৫ মিনিটে হুযূর (আই.) পতাকা উত্তোলন ও দোয়া পরিচালনা করেন। এরপর হুযূর (আই.)-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহতরম মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব। এরপর ফার্সি ও উর্দূ নযম পাঠ করা হয়। এরপর হযরত আমীরুল মু'মিনীন গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা রাখেন।

জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় ২৯ জুলাই, বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টায়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। এতে **'মহানবী (সা.)-এর পারিবারিক জীবন'** বিষয়ে বক্তব্য রাখেন- মওলানা মুনির আহমদ হাফিযাবাদী, উকিলে আলা, তাহরীকে জাদীদ, কাদিয়ান।

নিম্নে তার বক্তৃতার অংশবিশেষ উল্লেখ করা হলো– মহানবী (সা.)-এর সত্ত্বা এমন এক সত্তা যাঁর প্রত্যেক কর্মে খোদা

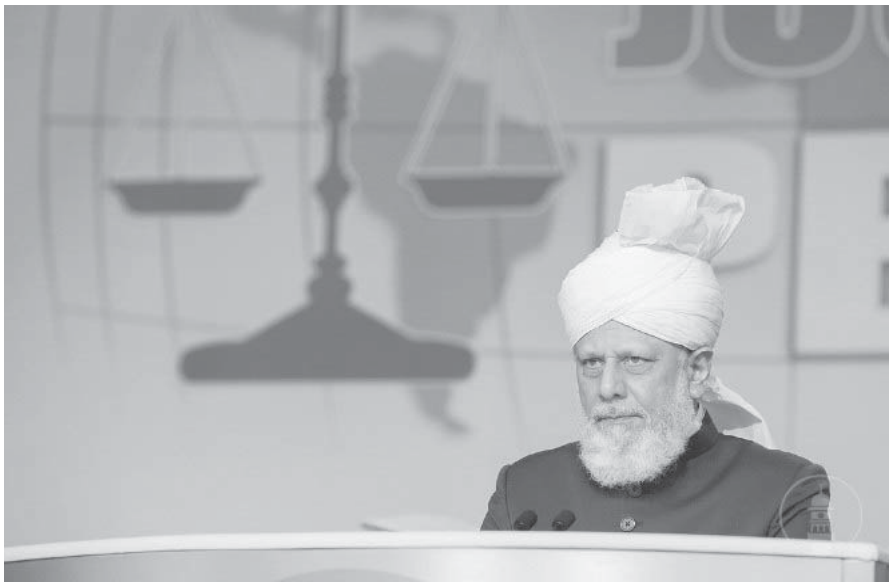

তা'লার গুণাবলীর জ্যোতির্ময় পরিস্ফুটন দৃশ্যমান। তাঁর প্রত্যেক কাজের লক্ষ্যস্থল খোদাই ছিলেন। তাঁর ভালোবাসা, তাঁর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি, তাঁর ইবাদত, তাঁর কুরবানী এক কথায় তাঁর প্রত্যেক কাজের কিবলা বা কেন্দ্রে খোদা তা'লার সত্ত্বা বিদ্যমান। সৈয়্যদেনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজের ফার্সী কবিতায় বলেন, অর্থাৎ, তাঁর সত্ত্বার প্রত্যেক শিরা উপশিরা নিজ প্রেমাস্পদের ঘরে পরিণত হয়েছিল। তাঁর প্রতিটি নিঃশ্বাস এবং দেহের প্রত্যেকটি কলা ও কোষ নিজের অনুগ্রহশীল বন্ধুর সৌন্দর্য্যে ভরপুর ছিল। এটা আমরা তার পারিবারিক জীবনেও সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করি। উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রা.) যিনি দশ বছর পর্যন্ত রসূল (সা.)-কে অত্যন্ত কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনি তাঁর (সা.) পারিবারিক জীবনের সবচে' বড় সাক্ষ্যদাতা ছিলেন। হযরত সাদ বিন হিশাম (রা.) যখন তাঁকে মহানবী (সা.)-এর চরিত্র-রীতিনীতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তখন তিনি উত্তর দেন, **'কানা খুলুকুহুল কুরআন'** অর্থাৎ তাঁর জীবনাদর্শ তো মূর্তিমান কুরআন ছিল।

এরপর বক্তা বিভিন্ন কুরআন হাদীসের আলোকে বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন।

এরপর **'হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর লেখনীর বৈপ্লবিক প্রভাব'** বিষয়ে বক্তব্য রাখেন- ড. জাহিদ আহমদ খান, সভাপতি, কাযা বোর্ড, যুক্তরাজ্য। তিনি তার বক্তৃতায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকের মাধ্যমে পথহারা ব্যক্তিরা কিভাবে আলোর সন্ধান লাভ করেন এ বিষয়টি বিভিন্ন সত্য ঘটনার মাধ্যমে তুলে ধরেন। এরপর বক্তৃতা রাখেন মওলানা ফরিদ আহমদ নাভীদ, প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া ঘানা, তার বক্তৃতার বিষয় ছিল– **আজ আমাদের কর্তব্য চতুর্দিকে এ বাণীকে ছড়িয়ে দেয়া।** তিনি তার বক্তৃতায় আহমদীয়া জামা'তের বাণী প্রচারের কাজে সকলকে বর্ধিত গতি সঞ্চার করার আহ্বান জানান।

এরপর বিকাল ৫টায় মহিলা জলসাগাহে হুযূর (আই.)-এর শুভাগমন হয়। কুরআন ও নযম পাঠের পর হুযূর (আই.) শিক্ষা ক্ষেত্রে সফলতার জন্য কৃতি ছাত্রীদের মাঝে সনদ ও মেডেল প্রদান করেন। এরপর হুযূর (আই.) মহিলাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় পর্দা মেনে জীবন যাপনের বিষয়ে সকলকে তাকিদ প্রদান করেন।

জলসার তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় রাত ৮.০০ টায়। প্রথমে আমন্ত্রিত বিভিন্ন অতিথিবৃন্দ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ তাদের শুভেচ্ছা বক্তৃতায় বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যে শান্তির জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে, তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কুরআন ও নযম পাঠের পর হুযূর (আই.) গত এক বছরে বিশ্বে আহমদীয়া জামা'তের অগ্রগতির এক ঝলক তুলে ধরেন। হুযূর (আই.) বলেন– এ অধিবেশনে আল্লাহর কৃপারাজির যে বৃষ্টি আহমদীয়া জামা'তে বর্ষিত হচ্ছে সেগুলোর উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এ বছর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় নতুন একটি দেশে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। দেশটি হল হন্ডুরাস। এখানে ৫১জন আহমদীয়াত গ্রহণ করে, যার ফলে সেখানে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্‌র কৃপায় বর্তমানে পৃথিবীর ২১০টি দেশে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হন্ডুরাস দেশটি মধ্য আফ্রিকায় অবস্থিত। দেশটির স্থানীয় ভাষা হল স্পেনিশ। জনসংখ্যা ৮ কোটি ৩ লক্ষের কাছাকাছি।

হুযূর (আই.) বলেন, ১৯৮৪ সালের জিয়াউল হকের কুখ্যাতি ২০ নম্বর অর্ডিনেন্স এর পর গত ৩৩ বছরে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ১১৯ টি দেশে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠা পেছেন। এ বছর ৬ লাখ ৯ হাজার ৫৫৬ জন বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তে প্রবেশ করেন। সবচেয়ে বেশি বয়আত গ্রহণ করেছে ঘানা, নাইজেরিয়া, আইভোরিকোষ্ট, সিয়েরালিওন, বেনিন, বুরকিনাফাঁসো ইত্যাদি দেশ থেকে। এ বছর পাকিস্তান ছাড়া নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠা হয়েছে ৮৮৫টি স্থানে। এছাড়া ১০৫৬টি নতুন জায়গায় প্রথমবার আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছেছে। এ বছর আল্লাহ্‌র কৃপায় ৪১৭টি নতুন মসজিদ আহমদীয়া জামা'তে যোগ হয়। এর মধ্যে ২৬২টি পূর্ব নির্মিত মসজিদ জামা'তের হাতে এসেছে। ৭৫টি ভাষায় পবিত্র কুরআনের

অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে। হুযূর (আই.) বাংলাডেস্কের কথাও উল্লেখ করেন। হুযূর (আই.) বিশ্বব্যাপী বই-পুস্তক প্রকাশ, লিফলেট বিতরণ, ওয়াকারে আমলসহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। এছাড়া হুযূর (আই.) বিভিন্ন ঈমান বর্ধক ঘটনার উল্লেখ করেন। এতে আহমদীয়া বিরোধিদের আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে শাস্তি প্রদান করেন তারও কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরেন। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের একটি ঘটনা উল্লেখ করেন যে, এক ব্যক্তি নিজেকে খলীফা দাবি করত, তাকে আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে শাস্তি দিয়েছেন এ বিষয়ে হুযূর (আই.) উল্লেখ করেন।

জলসার ৪র্থ অবিবেশন শুরু হয় রবিবার বেলা ৩টায়। কুরআন তেলাওয়াত ও উর্দু নযম পাঠের পর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। প্রথমেই **'খেলাফতের আশিসমণ্ডিত নেয়ামত ও আমাদের দায়িত্ব'** বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম সালিক আহমদ, সদর, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, পাকিস্তান। তিনি সূরের নূরের ৬৫ নং আয়াত পাঠ করে বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি তার বক্তৃতায় এ বিষয়টি স্পষ্ট করেন যে, সকল উন্নতি কেবল মাত্র খেলাফতের সাথে সুগভির সম্পর্কের ফলেই লাভ হতে পারে। তিনি বলেন- আহমদীয়া খিলাফতের এই পুরস্কারের সংক্ষিপ্ত চিত্র উল্লেখ করতে গিয়ে সৈয়দনা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) তাঁর এক জুমুআর খুতবায় বলেন-"এমন কোন জাগতিক নেতা আছে কি যে অসুস্থ্য এবং রুগ্ন মানুষের জন্য দোয়াও করে? এমন কোন নেতা আছে কি, যে স্ব-জাতির মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ থাকেন এবং তাদের জন্য দোয়া করেন? এমন নেতা কোথায়, যে ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার বিষয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকেন?....

বর্তমানে মঙ্গলাজ্ঞার এ চিন্তা শুধুমাত্র যুগ-খলীফার রয়েছে। আহমদীয়া জামা'তের সদস্যরা সেই সৌভাগ্যবান যাদেরকে নিয়ে যুগ-খলীফা চিন্তা করেন, যেন তারা শিক্ষা অর্জন করে। তাদের সু-স্বাস্থ্যের চিন্তা যুগ-খলীফা করে থাকেন। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধনের ক্ষেত্রেও সমস্যাদি রয়েছে। যাহোক পৃথিবীময় বিস্তৃত আহমদীদের সমষ্টিগত বা ব্যক্তিগত এমন কোন বিষয় নেই, যার উপর খলীফায়ে ওয়াক্তের দৃষ্টি নেই বা যার সমাধানের ব্যাপারে খলীফায়ে ওয়াক্ত ব্যবহারিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি আল্লাহ্‌র দরবারে সেজদাবনত হন না বা তার দরবারে দোয়া করেন না। আমিও এবং আমার পূর্বের খলীফারাও এসব কাজই তো করেছেন।... পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই, যেখানে রাতে ঘুমানোর পূর্বে কল্পনার জগতে সেখানে আমি না পৌঁছি আর শয়নে, জাগরণে তাদের জন্য দোয়া করি না, এমনটি হয় না।" তিনি তার বক্তৃতায় আরো বলেন, এটি তো সেই সমুদ্রের পানির একটি ফোঁটা বা বিন্দু মাত্র, যা আমরা মহান পুরস্কার হিসেবে লাভ করেছি।

বর্তমানে পৃথিবীতে আহমদীয়া জামা'ত ছাড়া অন্য কেউ এই দাবি করতে পারে না যে, তাদের কাছে এমন নেতা বা ইমাম আছে, যিনি তাদের জন্য এভাবে ব্যাকুল থাকেন, পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে

বসবাসকারীদের চিন্তায় চিন্তিত থাকেন, যিনি সমস্ত রাত আল্লাহ্ তা'লার সমীপে তাদের জন্য দোয়ায় রত থাকেন। সকাল-সন্ধ্যা যিনি আমাদের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে চিন্তা করেন এবং তা দূরীভূত করার জন্য চিন্তিত থাকেন। এমন একজনকেও পাবেন না, কেবলমাত্র খলীফাতুল মসীহ্ ব্যতীত।

এরপর **'পবিত্র কুরআন অনুসারে প্রকৃত জিহাদের ধারণা'** বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আযহার হানিফ, নায়েব আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ, যুক্তরাষ্ট। তিনি তার বক্তৃতায় পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যে, বর্তমান যুগের জিহাদের সাথে কুরআন ও হাদীসের কোন মিল নাই। বর্তমান যুগ যে অস্ত্রের জিহাদের যুগ নয় বরং যুক্তি প্রমাণের জিহাদের যুগ তাও তিনি উল্লেখ করেন। এরপর **'ঐশী সাহায্য আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ'** বিষয়ে বক্তব্য রাখেন–মওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ, ন্যায়েব আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ এবং ইমাম মসজিদ ফযল, লন্ডন। আল্লাহ্ তা'লা যে তার বান্দার আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ থেকে রক্ষা করেন এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি ঈমান বর্ধক ঘটনা তিনি উপস্থাপন করেন। তার বক্তৃতার একাংশে তিনি বলেন, হযরত নূহ্ (আ.), হযরত ইবরাহীম, হযরত ইউসূফ, হযরত মূসা, হযরত ইউনুছ, হযরত ঈসা আলাইহিমুস সালাম এবং অন্যান্য নবীর উপমা পবিত্র কুরআনে বার বার বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন সদা সব নবী এবং তাঁদের অনুসারীদের শিরে ছায়া হিসেবে বিরাজমান ছিল। খোদার হিফাযতের বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন-জামাতের একজন নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিতপ্রাণ ডাক্তার মোহাম্মদ রমযান সাহেব তুর্ক বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তার হাতে আরোগ্য রেখেছেন। (অর্থাৎ, তার চিকিৎসায় রোগীরা আরোগ্য লাভ করে) তার সু-খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা অনেক মানুষের পছন্দ ছিল না। আহমদীয়াতের অজুহাত দেখিয়ে কয়েকজন তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র আঁটে।

একরাতে এই ষড়যন্ত্রকে কার্যকর করার জন্য লোকেরা অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তার বাড়ীতে যায়। তার ভৃত্য তাদেরকে দেখতে পেয়ে দরজা বন্ধ করে রাখে। কিন্তু তিনি তাদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে ভৃত্যকে বলেন, দরজা খুলে দাও আর তাদেরকে বৈঠকখানায় বসাও। ভৃত্য তাই করে। ইতিমধ্যে ডাক্তার সাহেব ও প্রস্তুত হয়ে বৈঠকখানায় আসেন এবং আগত লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা তো আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই এসেছ তাই না? তাহলে আমাকে দু'রাকাত নফল নামায পড়তে দাও, এর পর তোমাদের যা মন চায় করো। সুতরাং তিনি তাদের অনুমতি নিয়ে নফল নামায পড়তে আরম্ভ করেন। তখনও তিনি সেজদাতেই ছিলেন এমতাবস্থায় খোদাই জানে তাদের কি হয়েছিল যে, তারা সবাই উঠে চলে যায়। এভাবে আল্লাহ্ তা'লার অদৃশ্য হাত মরহুম ডাক্তার সাহেবকে আক্রমনকারীদের হাত থেকে রক্ষা করে অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করেন।

এরপর **'এ যুগের পাপসমূহ এবং পবিত্র জীবন লাভের উপায়'** এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব রফিক আহমদ হায়াত, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত,

ইউকে। তিনি তার বক্তৃতায় বিশ্বের সমকালীন সমস্যাবলী তুলে ধরে বলেন- দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, অপরের অধিকার আদায় না করা এবং দুর্বলদের শোষণ আজকে সর্বদা বিরাজমান। দারিদ্র, মাদকাসক্তি, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতি দৃশ্যমান। মানবতা যখন এর সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে তখনই আল্লাহ্‌তা'লা নিজ অনুগ্রহে নবী প্রেরণ করেন, এসব নবী ধরণীতে আসেন আল্লাহ্‌তা'লার করুণা এবং আলোকিত পথ প্রদর্শনের জন্য যাতে মানবজাতি সার্বিক ধ্বংস হতে রক্ষা পেতে পারে।

আল্লাহ্‌র নবীগণ সব যুগেই আসেন এবং পৃথিবীর সব অংশে আবির্ভূত হন। তাঁদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেদের উৎকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করে মানবজাতিকে তার সৃষ্টিকর্তার দিকে ফিরিয়ে আনা। অতএব, এসব বিবরণ মাথায় রেখে আমরা আমাদের জিজ্ঞেস করতে পারি, কী বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করলে আমরা একটি পবিত্র জীবন অর্জন করতে পারি আর কিভাবে সমাজ থেকে এই অনিষ্ট দূর করতে পারি?

আমাদের খুব বেশি দূরে যাবার প্রয়োজন নেই। পবিত্র কুরআন, নবীকুল শিরোমনি, খাতামান্নাবীঈন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং ইসলামের মাধ্যমেই আমাদেরকে আশিসপূর্ণ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনের সূরা মায়দার ৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে- "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করলাম আর আমি ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্মরূপে মনোনীত করলাম।"

তিনি তার বক্তৃতায় আরো বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে, তাঁর (সা.) প্রদর্শিত পথ এবং জীবনযাপনের সৎপথের নিদর্শন লাভ করে সমগ্র মানবজাতি ধন্য হয়েছে। আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য হয়ে, এযুগের মসীহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) কে মেনে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছি, যিনি একজন সংস্কারক হিসেবে ইসলামের মূল শিক্ষাকে ফিরিয়ে আনতে আবির্ভূত হয়েছেন। পবিত্র কুরআনে একজন সৎকর্মশীল বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আলে ইমরানের ১৩৫-১৩৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে-"যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল (অবস্থায় আল্লাহ্‌র পথে) খরচ করে, যারা ক্রোধ দমন করে এবংমানুষকে মার্জনা করে।আর আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।" "এবং যারা কোন অশ্লীল কাজ করে বসলেঅথবা নিজেদের উপর জুলুম করে ফেললে তারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবংনিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া পাপ ক্ষমা করার আর কে আছে–এবং তারা যা করে ফেলেছে তারা জেনেশুনে তাতে লিপ্ত থাকে না।"

"এদেরই পুরস্কার হল, এদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং এমন সব জান্নাত,যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে এরা চিরকাল থাকবে। আর (সৎ) কর্মশীলদের (এ) পুরস্কার কত উত্তম।" তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা সুস্পষ্টভাবে একটি জীবনাদর্শ বর্ণনা করেছেন, যাতে করে একজন মানুষ একটি পবিত্র জীবন লাভ করতে পারে এবং আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে পারে।

আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠান শুরু হয় বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬:০০টায়। এক পরম আবেগঘন পরিবেশে প্রায় ৪০ হাজার সৌভাগ্যবান আহমদী এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় খলীফার হাতে হাত রেখে বয়আত করেছেন। এছাড়া সারা বিশ্বে টিভি-ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে সরাসরি কোটি কোটি আহমদী এ বয়আত করার সুযোগ পেয়েছেন।

সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় রাত ৮টায়। প্রথমে আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন-আহমদীয়া জামা'তের সদস্যরা সর্বত্র শান্তির জন্য কাজ করছেন। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে হিউম্যানিটি ফার্স্টের মাধ্যমে মানব সেবা করছেন। এছাড়া আহমদীয়া খলীফা শান্তির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। এতে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীও জলসার সফলতা কামনা করে ভিডিও বার্তা প্রেরণ করেন আর কতিপয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবৃন্দ স্ব-স্ব দেশের পক্ষ থেকেও শুভেচ্ছা বক্তব্য রেখেছেন।

এরপর কুরআন তেলাওয়াত, নযম পাঠের পর শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য কৃতি ছাত্রদের মাঝে হুযূর (আই.) পুরস্কার বিতরণ করেন।

পুরস্কার বিতরণ শেষে হুযূর (আই.) সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বিশ্বে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা লাভ হতে পারে তা কুরআন হাদীসের আলোকে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেন। বিশেষ করে মুসলিম দেশে ধর্মের নামে যে বিশৃংখলা হচ্ছে। এ থেকে উদ্ধারের উপায়ও বাতলে দেন। শেষে হুযূর (আই.) দোয়া পরিচালনা করেন। হুযূর (আই.)-এর দোয়ার মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের ৫১তম জলসার সফল সমাপ্তি হয়। শেষে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত কতিপয় সদস্য নিজস্ব আবেগময় ভাষায় হুযূর (আই.)-কে নযম শোনায়। বাংলায় পরিবেশন করা হয় মরহুম মৌলবী সলিমুল্লাহ সাহেব রচিত 'জাগোরে নও জোয়ান' নযমটি। এবারের জলসায় বাংলাদেশ থেকে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর এবং সেক্রেটারী তালীমসহ আরো কয়েকজন যোগদান করার সৌভাগ্য পেয়েছেন।

উক্ত জলসায় ১১৪টি দেশ থেকে ৩৭ হাজার ৩শ ৯৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

মাহমুদ আহমদ সুমন
বাংলাডেস্ক, ঢাকা

সংবাদ

বিভিন্ন জামাতে যথাযোগ্য ভাবগাম্ভীর্যতার সাথে সিরাতুন্নবী (সা.) সেমিনার অনুষ্ঠিত

মিরপুর

গত ২২ জুলাই, ২০১৭ রোজ শনিবার বাদ আসর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুর এর উদ্যোগে "সিরাতুন্নবী (সা.) আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর সভা" মিরপুর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। সভায় সভাপতিত্ব করেন মোহতরম সৈয়দ আব্দুল হান্নান, নায়েব আমীর-১, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহতরম মোহাম্মদ গোলাম কাদের। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, মুরুব্বী সিলসিলা। আহমদীয়া মুসলিম জামাত এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করেন হাফেজ আবুল খায়ের, মোয়াল্লেম, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুর। মাগরিবের নামাজের বিরতির পর পুনরায় সভার কাজ শুরু হয়। "মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তম জীবনাদর্শ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন ও আগত জেরে তবলীগ মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান সুমন, মুরুব্বী সিলসিলা।

সিরাতুন্নবী (সা.) সেমিনারে এমটিএতে সরাসরি সম্প্রচারিত 'সত্যের সন্ধানে' প্রোগ্রাম দেখানো হয় এবং উপস্থিত অংশগ্রহনকারীগন এতে প্রশ্ন করেন। সেমিনার রাত ১০.০০ ঘটিকা পর্যন্ত চলে।

সেমিনারে ৮৫ জন মেহমান (জেরে তবলীগ) সহ ৪০০ জন উপস্থিত ছিলেন এবং উপস্থিত মেহমানদের মধ্য থেকে ৮ জন জেরে তবলীগ বয়আত করেন, আলহামদুল্লিাহ। সম্মেলনে অংশগ্রহনকারী সকলের নৈশ-আহারের ব্যবস্থা ছিল।

মোহাম্মদ মামুনুল হক, সেক্রেটারী তবলীগ

কোড্ডা

গত ১৫/০৭/২০১৭ রোজ শনিবার বাদ আসর হতে মাগরিব ও এশার নামায জমা পড়ে রাত ৯টা পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কোড্ডায় মজলিস আনসারুল্লাহ্ স্থানীয় যয়ীম সহ আনসারুল্লাহ্ সকল ভাইদের সহযোগিতায়, সাবিক তত্ত্বাবধানে তবলীগ খাস কমিটি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কতৃক আয়োজিত সীরতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত হয়।

উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব গাজী মাজহারুল খোকন। বিশেষ অতিথি ছিলেন মৌঃ মুহাম্মদ শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, মুরুব্বী সিলসিলা আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘাটুরা। জলসা শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন স্থানীয় আনসারুল্লাহ্ সদস্য জানাব এজাজ আহমদ ভুইয়া। নযম ও বক্তব্য রাখেন। আনসারুল্লাহ্র স্থানীয় যয়ীম জনাব এনামুল হক ইন্টু। আরও বক্তব্য রাখেন স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব আব্দুল হাকীম। চা-পান ও বিরতির পর নযম পাঠ করেন জনাব তৌফিক আহমদ ভুইয়া।

পরবর্তীতে বক্তব্যের পালা শুরু হয়। জনাব আমীর মাহমুদ ভুইয়া বিষ্ণুপুর এবং তবলীগ খাস কমিটি আনাসারুল্লাহ্র সহ-সভাপতি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, তারপর বক্তব্য রাখেন, জনাব মোশারফ হোসেন রিজিওনাল নাযেমে আলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-সিলেট রিজিওন এবং তবলীগ খাস কমিটির সাধারণ সম্পাদক ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মৌ: মোহাম্মদ শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, মুরব্বী সিলসিলা আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঘাটুরা। পরিশেষে সভাপতির মূল্যবান বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত সীরাতুন নবী (সা.) জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত সীরাতুন নবী জলসায় মোট ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া কেন্দ্র থেকে ২ জন ওয়াকফে আরজি মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

তছলীম আহমদ

শালসিড়ী মজলিসে পাঠচক্র উপলক্ষে বনভোজন অনুষ্ঠিত

গত ২৯ জুন রোজ বৃহস্পতিবার ২০১৭ তারিখ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া শালসিড়ীর তালিম বিভাগের পক্ষ থেকে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর লেখা বই যে সব খোদ্দাম আতফালরা পড়েন তাদের নিয়ে নিকটস্থ বাগানে বনভোজনের আয়োজন করা হয়। আনসার, খোদ্দাম ও আতফালদের চারটি দলে বিভক্ত করে খেলা নেয়া হয় এবং দুইটি দল ফাইনালে যায় তার মধ্যে একটি দল ফাইনালে বিজয়ী হয়। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর লেখা পুস্তকের ওপর প্রতিযোগিতা নেয়ার পর দুপুরের খাওয়ার ও বিশ্রামের পর আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় কায়েদ সাহেবের অনুপস্থিতে এবং তার অনুমতিক্রমে পুরস্কার বিতরণ করেন নাযেম মজলিস জনাব মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম হাফিজ, আরো উপস্থিত ছিলেন এডিশনাল তালিম জনাব রাহুল আলি, নাযেম তরবিয়ত, কাওসার আলি, নাযেম আতফাল, শাহরিয়ার নাজিম জয়। দোয়ার মাধ্যমে উক্ত দিবসের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। এতে মোট উপস্থিত ছিলেন ৪৫ জন।

মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম হাফিজ

বিভিন্ন জামাতে ঈদপুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

সিলেট

মহান আল্লাহ্‌ তা'লার ফজলে গত ৭ জুলাই ২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সিলেটে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাসভবনে এক আরম্ভর পরিবেশে 'ঈদ পুনর্মিলন' অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন চৌধুরী। প্রধান অতিথি ছিলেন মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। সর্বপ্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব ফাহিম ইকবাল, বাংলা নযম পেশ করেন জনাব মাহমুদ আহমদ, কায়েদ সিলেট। এরপর পবিত্র ঈদুল ফিতর কে কিভাবে পালন করেন তা একে একে অভিব্যক্তি পেশ করেন সর্বজনাব এস.এ.এস কবির, যয়ীম সিলেট। জনাব গোলাম গাউস চৌধুরী, জনাব তসলীম ভূইয়া, জনাব ইকবাল হোসেন সেক্রেটারী তরবিয়ত ও জনাব বদরুল ইসলাম প্রমুখ। এরপর প্রধান অতিথি মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ ও জোনাল ইনচার্জ ঈদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। পরিশেষে সভাপতি সাহেব নিজের ঈদ উদযাপন ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা করে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। সবশেষে প্রধান অতিথি সাহেব ইজতেমায়ী দোয়া পাঠ করান। তারপর সকলে ঈদের আনন্দে নতুন করে পুনরায় কোলাকোলি করি এবং মিষ্টিমুখ করা হয়।

মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ রাজশাহী

গত ০৭-০৭-২০১৭ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ রাজশাহীর পক্ষ থেকে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তিলাওয়াত করেন আকলিমা খাতুন। দোয়া ও আহাদনামা পাঠ করেন প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ রাজশাহী, হাদীকাতুল জান্নাত এবং তরবিয়তী আলোচনা করেন আকলিমা খাতুন দোয়া ও আহাদনামা পাঠ করেন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ রাজশাহী। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪২ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি করা হয়।

আকলিমা খাতুন

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ রাজশাহীর উদ্যোগে নাসেরাত দিবস উদযাপন

গত ২৮/০২/২০১৭ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ রাজশাহীর উদ্যোগে নাসেরাত দিবস উদযাপিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআ তিলাওয়াত করেন সানজিদা নাসরিন দোয়া করান স্থানীয় প্রেসিডেন্ট হাদীকাতুল জান্নাত, আহাদনামা পাঠ করেন নাসেরাত সেক্রেটারী নাহিদা কানোয়াল।

এরপর কুরআন তিলাওয়াত ও নযম প্রতিযোগিতা হয়। নাসেরাতদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন নাসেরাত সেক্রেটারী ও মুফাত্তিস সাহেবা সাজলিনা রহমান। বিষয় ছিল 'হুযূর (আই.) কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক ভাষণ এবং মা ও শিশুর তরবিয়্যত' বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। পুরস্কার বিতরণী ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

আকলিমা খাতুন

শিশুদের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ

গত ১২/০৬/২০১৭ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ ঢাকার উদ্যোগে ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত "বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজবাহ উদ্দিন সাবু নৈশ বিদ্যালয়ের" সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের মাঝে রমযান মাসের ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণের এক কর্মসূচী পালন করা হয়। এখানে ১৫ জন লাজনা সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। লাজনার সদর ও ঢাকার প্রেসিডেন্ট সাহেবা শিশুদের মাঝে তাদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ৮৫ জন ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণ ও শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। সর্বমোট উপস্থিতি ২১৫ জন। ঈদ সামগ্রী পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা খুবই আপ্লুত হয় এবং উক্ত স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদসগণ ও শিক্ষাকগণও খুবই খুশী হন। তারা আমাদের মানব-সেবা কার্যক্রমের খুবই প্রশংসা করেন। তার আহ্বান করেন, আমরা যেন এই ধরনের কার্যক্রমের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখি, আলহামদুলিল্লাহ্‌।

শাহজাদী রোকেয়া

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে তালিমুল কুরআন ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২৬/০৫/২০১৭ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে তালিমুল কুরআন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন মোহতরমা সেলিনা তবশীর সাহেবা, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহতরমা ইসমত আরা। সভানেত্রী সাহেবা উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন। "কুরআন শিক্ষার সাধারণ কিছু নিয়ম" সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন মোহতরমা ফারহানা মাহমুদ সাহেবা ও মোহতরমা ফারহানা খন্দকার সাহেবা। সিলেবাসের শেষ দশটি সূরার ওপর ক্লাস নেন, মোহতরমা ফারজানা শহীদ সাহেবা। কুরআনের বিশেষ বিশেষ দোয়ার ফযিলতের সম্পর্কে ক্লাস নেন মোহতরমা সেলিনা তবশীর সাহেবা প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা। দ্বিতীয় অধিবেশনে উক্ত ক্লাস সমূহের ওপর মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। মোট উপস্থিত ছিল ৫০ জন। এবং পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন ৩৫ জন।

শাহজাদী রোকেয়া

তরবিয়তী সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ০৯/০৬/২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ-এর উদ্যোগে এক তরবিয়তী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের বিষয় "কুরআন পাঠের গুরুত্ব"। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আমীর সাহেব। নায়েব আমীর সাহেব, 'কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। সেক্রেটারী তরবিয়ত 'কুরআন পাঠের গুরুত্ব' বিষয়ে মওলানা তাহের আহমদ সাহেব এবং সভাপতি সাহেবের সমাপ্তি ভাষণের মাধ্যমে সেমিনার শেষ হয় উক্ত সেমিনারে মোট ৯২ জন উপস্থিত ছিলেন।

আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুরে আঞ্চলিক তরবিয়তী ক্লাস সম্পন্ন

গত ১৪ ও ১৫ জুলাই শুক্র ও শনিবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুরের উদ্যোগে ২ দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আঞ্চলিক তালীম তরবিয়ত ক্লাস পরিচালিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। ১৪ তরিখ সকাল ১.৩০ মিনিটে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি মিসেস নার্গিস ইসলাম সেক্রেটারী সানাত দস্তকারী লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশের সভাপতিত্বে ১ম ও উদ্বোধনী অধিবেশন আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন তিলাওয়াত করেন মিসেস আমাতুল মজিদ। উদ্বোধনী দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেবা। এরপর পর্যায়ক্রমে আহাদনামা, হাদীস, অমৃতবাণী, নযম (বাংলা) ও উর্দু কাসীদা পেশ করেন যথাক্রমে মিসেস আমাতুল মজিদ [স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্ সেক্রেটারী তালিম ও তরবিয়ত] সাহেবা, আমাতুর মজিদ, ফারহানা রেজোয়ানা, সালেহা আকতার, নিসাত তাসনীম ও ফাইজা আকতার। দোয়ার ক্লাস চলে দুপুর ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত, পরিচালনা করেন মিসেস ফাতেমা নুসরাত [সেক্রেটারী সেহ্‌তে জিসমানী লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ]। জুমুআর নামায ও খাওয়ার বিরতির পর বিকাল ৩.৩০ মিনিট হতে ২য় অধিবেশন শুরু হয়। কুরআন তিলাওয়াত ও নযমের পর উন্মুক্ত আলোচনা ও স্বাস্থ্য টিপস বিষয়ক ক্লাস নেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা বিকাল ৬.৩০ মিনিট পর্যন্ত। এরপর নাশতা ও হুযূরের খোৎবার পর ৭.৫০ মিনিট হতে ৮.৪৫ মিনিট পর্যন্ত আমেলা মিটিং পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা। পরদিন ১৫/০৭/২০১৭ তারিখ সকাল ১০.৪৫ মিনিট ৩য় ও সমাপনী অধিবেশন শুরু হয় কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পরিবেশনের মাধ্যমে। এরপর ধর্মীয় জ্ঞানের ওপর উন্মুক্ত কুইজ পরিচালনা করা হয় এবং সাথে সাথেই পুরস্কার প্রদান করা হয়। [উল্লেখ্য ২য় অধিবেশনে দোয়ার পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং সাথে সাথেই ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়]। এরপর নামায ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন প্রতিনিধিরা। দুপুর ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত। এরপর স্থানীয় প্রেসিডেন্ট মিসেস মুসতারীন আকতার-এর সমাপনী দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১ম দিনের উপস্থিতি ছিল মোট ২৫ জন। ২য় দিনের উপস্থিতি ছিল ১৯।

আমাতুল মজিদ

কৃতী ছাত্রী

আমাদের সেজো মেয়ে রেজওয়ানা তৌহিদ বুশরা, ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত HSC পরীক্ষায় বরিশাল বোর্ডের অধীনে পটুয়াখালী সরকারী মহিলা কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে GPA-5 (A+) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহি যালিক। ভবিষ্যতে সে যেন আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় ক্ষেত্রে উত্তোরত্তর উন্নতি করে দেশ-জাতি, ইসলাম আহমদীয়াতের জন্য সুনাম বয়ে আনতে পারে এ মর্মে সবার কাছে বিনীত দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

এস. এম. তৌহিদুল ইসলাম
মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ এবং
শাহনাজ পারভীন, প্রেসিডেন্ট

মসজলিস আনসারুল্লাহ্‌র কিশোরগঞ্জ জিলা ইজতেমা কটিয়াদিতে অনুষ্ঠিত

গত ১৪ ও ১৫ জুলাই ২০১৭ রোজ শুক্র ও শনিবার মসজলিস আনসারুল্লাহ্‌র কিশোরগঞ্জ জিলা ইজতেমা কটিয়াদিতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে ১০.৩০ মি. মোহতরম সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ জাতিয় পতাকা ও আনসারুল্লাহ্‌র পতাকা উত্তোলন ও আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। নামায জুমুআ ও আসর জমা আদায় করার পর ইজতেমার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মোহতরম সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ বাংলাদেশ। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব আব্দুর রব খন্দকার সাহেব। নযম উর্দু পাঠ করেন সালাওয়াত হোসেন। ইজতেমার উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন মোহতরম সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ বাংলাদেশ, স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন জেলা নাযেম আলা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন মোহতরম সদর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব হাসিব হাসান রতন সাহেব ও মিজানুর রহমান সাহেব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর পরই শুরু হয়– প্রতিযোগিতা। ৪.১৫ মিনিটে বিভিন্ন খেলাধূলা পরিচালনা করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব এম, এ, হান্নান সাহেব ও মৌলানা নাবিদ আহমদ লিমন সাহেব। খেলাধূলার মধ্যে ছিল বালিশ খেলা, ইন আউট, ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ ইত্যাদি। সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত হুযূরের জুমুআর খুতবা শ্রবণ ও খুতবার ওপরে মোহতরম সদর সাহেব খুতবার সারসংক্ষেপ নিয়ে প্রত্যেক আনসার ভাইদের আলোচনা করার জন্য বলা হয়েছিল। যারা হুযূরের খুতবার বিষয় ভালভাবে বলতে পেরেছে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। মাগরিব ও এশার নামাযের পর মজলিসের সাংগঠনিক আলোচনা করেন জনাব হাসিব হাসান রতন সাহেব ও বিভাগীয় নাযেম জনাব মিজানুর রহমান সাহেব।

রাত ৯ ঘটিকায়- খাওয়া দাওয়া ও নিদ্রা যাপন ৩.২০ মিনিটে নামাযে তাহাজ্জুদ ও ফজর নামায পড়ান মৌলানা নাভিদ আহমদ লিমন সাহেব। ফজর নামাযের পর চা-নাস্তা দেওয়া হয়। ১৫/০৭/২০১৭ রোজ শনিবার সকাল ৮.৩০ মনিটে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন জনাব মৌলানা নাবিদ আহমদ লিমন ও মোয়াল্লেম ইসমতউল্লাহ্‌ মিয়াজি এবং আবু নাঈম সাহেব। প্রতিযোগিতা ছিল কুরআন তিলাওয়াত উর্দু ও বাংলা নযম, বক্তৃতা, কুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

দুপুরে গোসল ও খাওয়া-দাওয়ার পর যোহর ও আসর জমা নামাযের পর ৪.২০ মিনিটে সমাপনি অধিবেশনের সভাপতি আসন গ্রহণ করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এম, এ, হান্নান সাহেব। সদর সাহেবের সম্মানিত প্রতিনিধি হাসিব হাসান রতন সাহেব ও বিভাগীয় নাযেম মিজানুর রহমান সাহেব। তাঁদের সমাপনী ভাষণের পর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন জেলা নাযেম আলা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সাহেব। পরিশেষে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত জেলা ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ থাকে যে কিশোরগঞ্জ জেলার ৬টি মজলিস ও ৩টি হালকা থেকে জেরে তবলীগ ও নওমোবাঈন সহ ইজতেমায় মোট ৮১ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

"যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাত শত আদেশের মধ্যে একটি ছোট আদেশও লংঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে।"

–হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)

ব্রিটিশ মন্ত্রী লর্ড তারিক মাহমুদ আহমদকে সংবর্ধনা

সফররত ব্রিটিশ সরকারের কমনওয়েলথ ও জাতিসঙ্ঘ বিষয়ক সহকারী মন্ত্রী লর্ড তারিক মাহমুদ আহমদকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের জাতীয় কার্যালয়ে এক সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। লর্ড তারিক মাহমুদ আহমদ যিনি লর্ড আহমদ অব উইমবল্ডন নামে সমধিক পরিচিত, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের একজন সক্রিয় সদস্য এবং বিভিন্ন সময়ে তিনি জামা'তের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে নিজেকে জড়িত রেখেছেন। মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশন্যালে "ফেইথ ম্যাটারস" নামে একটি অনুষ্ঠানও তিনি পরিচালনা করে থাকেন।

৮ আগষ্ট বেলা ১২টার দিকে তিনি ঢাকার বকশিবাজারস্থ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জাতীয় কেন্দ্রে আগমন করেন। তাঁর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের সহকারী হাইকমিশনার এবং কয়েকজন উর্ধতন কর্মকর্তাও ছিলেন। সংক্ষিপ্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন জামা'তের অন্যতম নায়েব আমীর প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী এবং সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন। স্বাগত ভাষনে মীর মোবাশ্বের আলী লর্ড আহমদের কর্মময় জীবন এবং তাঁর পেশাগত কাজকর্মের পাশাপাশি জামা'তের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা এবং ভালবাসার বর্ণনা প্রদান করেন। মানবাধিকার, ভ্রাতৃত্ব এবং সামাজিক শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনে লর্ড আহমদের ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি তাঁর সফলতা এবং দীর্ঘায়ূ কামনা করেন। প্রফেসর মোবাশ্বের আলী বলেন, বিগত কিছুকাল যাবত যুক্তরাজ্যের ভিসা অফিস ঢাকা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরের ফলে বাংলাদেশের মানুষ নানা ভোগান্তির শিকার হচ্ছে, তাই তিনি বাংলাদেশের জনগনের সুবিধার্থে ভিসা অফিস পুনরায় বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার আবেদন জানান।

লর্ড আহমদ তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন এদেশের মানুষের অতিথি পরায়ণতা যুগ যুগ ধরে স্বীকৃত। বাংলাদেশের উষ্ণ আবহাওয়ার মতই এদেশের মানুষের হৃদয়ও উষ্ণ ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। তিনি জঙ্গীবাদ ও ধর্মীয় উগ্রবাদ মোকাবেলায় বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের প্রশংসা করেন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন লেখক ও সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির। অনুষ্ঠানে দেশের নাগরিক সমাজের বেশ কয়েকজন ব্যক্তিত্ব এবং আহমদীয়া জামা'তের পাঁচশতাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

আহমদ তবশির চৌধুরী
বহিঃসম্পর্ক ও গণসংযোগ সম্পাদক
মোবাইল: ০১৭১৩০২৪৪১৩
ই-মেইল: atabshir@gmail.com

ঈদুল আযহার শুভেচ্ছা

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই পবিত্র ঈদুল আযহার শুভেচ্ছা 'ঈদ মুবারক'। পবিত্র ঈদুল আযহা সকলের জন্য বয়ে আনুক অশেষ কল্যাণ ও বরকত।

–সম্পাদক

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর,
মাহবুব হোসেন
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

* শুভ বিবাহ *

গত ১২/০১/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ নাসরিন আক্তার, পিতার- মোহাম্মদ আলী আহমদ, আহমদনগর-এর সাথে মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম, পিতা- মোহাম্মদ বাবলু মিয়া, নিয়ামতপুর- এর বিবাহ ১,৮০,০০০ (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৩৯৫/১৭

গত ২০/০১/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ স্মৃতি আক্তার, পিতার- মোহাম্মদ আক্তার মিয়া, গ্রাম-তারুয়া, আশুগঞ্জ, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম (সানি), পিতামৃত- মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, কান্দিপাড়া জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ৩,৫০,০০০ (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৩৯৬/১৭

গত ২০/০১/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ ইশরাত জাহান (চায়না), পিতামৃত- মোহাম্মদ কালা গাজী গ্রাম: শালগাও, পো: বড় কালিসীমা, থানা+জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে মোহাম্মদ আজিজুল হক (নাসির মৃধা), পিতামৃত- মোহাম্মদ আদম আলী মৃধা গ্রাম: কুকুয়া, পো: সোহরাওয়ার্দী হাইস্কুল, থানা: আমতলী, জেলা-বরগুনা-এর বিবাহ ১০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৩৯৭/১৭

গত ১৭/০৩/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ জুলেখা আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ নায়েব আলী ভঁইয়া, গ্রাম+পো: হোসনাবাদ, থানা সরিষাবাড়ী, জেলা: জামালপুর-এর সাথে মোহাম্মদ সোহেল রানা (সালেক), পিতামৃত- মোহাম্মদ আব্দুল খালেক, গ্রাম উত্তর বাহের চর, থানা কেরানীগঞ্জ, জেলা-ঢাকা-এর সাথে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৩৯৮/১৭

গত ১৭/০২/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ মরিয়ম ছিদ্দিকা (মিটুল), পিতা- মোহাম্মদ আবুল খায়ের, ২/এফ নাসিম বাগ মিরপুর-২ ঢাকা-১২১৬, থানা: মিরপুর, জেলা: ঢাকা-এর সাথে মোহাম্মদ ইয়ামিন আহমদ, পিতামৃত- মোহাম্মদ শরীফ আহমদ, উত্তর মাসদাইর, থানা: ফতুল্লা, জেলা: নারায়ণগঞ্জ-এর বিবাহ ২,০০,০০১/- (দুই লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৩৯৯৮/১৭

গত ২৫/০২/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ মাসুমা আক্তার, পিতামৃত- মোহাম্মদ শামছুজ্জামান, পূর্ব মিরপুর মিরপুর-২ ঢাকা-১২১৬-এর সাথে মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম, পিতা- মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, গ্রাম:+পো: ভাদুঘর, থানা জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সদর-এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (এক লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪০০/১৭

গত ০৭/০৩/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ তাহবিবা সুলতানা (জ্যাতি), পিতা- মোহাম্মদ সফিকুর রহমান, লক্ষীপুর, জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ-এর সাথে মোহাম্মদ ছারোয়ার হোসেন চৌধুরী, পিতামৃত- মোহাম্মদ আব্দুল কাদির চৌধুরী, গ্রাম:চন্ডিছড়া চা বাগান, চুনারঘাট, জেলা: হবিগঞ্জ-এর বিবাহ ১,০১,০০০/- (এক লক্ষ এক হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪০১/১৭

গত ২৫/০২/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ সোনিয়া সুলতানা, পিতা- মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান (পিল্টু), উথুলী, জীবন নগর, চুয়াডাঙ্গা-এর সাথে মোহাম্মদ মওদুদ আহমেদ, পিতা-মোহাম্মদ আক্বাচ আলী, ০০০/৪ আহম্মদনগর, মিরপুর ঢাকা-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪০২/১৭

গত ০৩/০২/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ শারমীন খাতুন, পিতা- মোহাম্মদ সাহেব আলী, গ্রাম: সৈয়দপুর, পো: মচমাইল, থানা: বাগমারা, জেলা: রাজশাহী-এর সাথে মোহাম্মদ ইমরান আহমেদ, পিতা- মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন, হুসনাবাদ, সরিষাবাড়ী, জামালপুর-এর বিবাহ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪০৩/১৭

গত ০৩/০৩/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ ডাঃ রাইসা আজমী পিতা-প্রফেসর ডাঃ মোহাম্মদ হারুন আর রশীদ, ৪/৭, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭-এর সাথে ডাঃ মোহাম্মদ ইমরান আহমেদ, পিতা- মোহাম্মদ মোতাহার আহমেদ চৌধুরী ৯/এ, নর্থ ধানমন্ডি, কলাবাগান-এর বিবাহ ৩০,০০,০০০/- (তিরশ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪০৪/১৭

গত ৩১/০১/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ হোসনেআরা (মৌসুমী), পিতা-আলহাজ্জ মোহাম্মদ আবুল হোসেন, ৫৩-এ/এ ২য় কলোনী চৈতালী সড়ক, ঢাকা-১২১৬-এর সাথে মোহাম্মদ শাহরিয়ার সাইদ, পিতা- মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম, ৯২ পূর্ব তেজতুরী বাজার, বি-২ তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫-এর বিবাহ ৩,০০,০০১/- (তিন লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪০৫/১৭

গত ১৭/০২/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ ইফরা তুন নূর, পিতামৃত-ডাঃ মোহাম্মদ ফরিদ আহমেদ, উত্তর আলেকান্দা, বরিশাল-এর সাথে মোহাম্মদ নাজমুল হুদা রুবেল, পিতা- মোহাম্মদ নূরুল হুদা, ৩৯৯, উত্তর নয়নাগর, ভাট্রারা-এর বিবাহ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪০৬/১৭

গত ০৩/০২/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎনুসরাত জাহান (সিমা), পিতা- মোহাম্মদ জীবন মিয়া, তেরগাতি, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ-এর সাথে মোহাম্মদ ফরহাদ আহমেদ স্বপন, পিতামৃত-মরহুম মোহাম্মদ ছিদ্দিক আহমেদ, কান্দিপাড়া-এর বিবাহ ১,৯০,০০১/- (এক লক্ষ নব্বই হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪০৭/১৭

গত ২৪/০১/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ শাহজাদী রোকেয়া, পিতামৃত-শাহ্ আকিল আহমেদ, গ্রাম: কিদিরপুর, পো: ভীমখালী বাজার, থানা:+জেলা: সুনামগঞ্জ-এর সাথে মোহাম্মদ রফিক উর রহমান, পিতা- মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান শাহবাজপুর, নবীনগর ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ১০,০০,০০১/- (দশ লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪০৮/১৭

গত ১৪/০২/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ তাহমিনা আক্তার (সুইটি), পিতা- মোহাম্মদ তমিজউদ্দিন (রেনু) গ্রাম: সোনা চান্দি, থানা: বোদা, জেলা পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ রায়হান আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ শরীফ সরদার গ্রাম: যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ১,০৪৯৯৯/- (এক লক্ষ চার হাজার নয় শত নিরান্নব্বই) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪০৯/১৭

গত ০১/০১/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ সুচনা সিকদার, পিতামৃত- মোহাম্মদ নিয়ামত উল্লাহ্ সিকদার, গ্রাম: নাটাই, থানা:+জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে মোহাম্মদ হিমেল, পিতামৃত- মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম রামনগর মুন্সিগঞ্জ-এর বিবাহ ৪,০০,০০১/- (চার লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪১০/১৭

আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ করুন

হুযূর(আই.)-এর ৩০শে ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখের খুতবার আলোকে প্রস্তুতকৃত

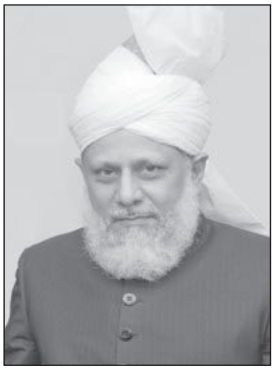

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ(আই.)

১। আমরা কি বয়াতের ১০টি শর্ত গত বছর যথাযথভাবে পালন করেছি?

২। আমরা কি শির্‌ক থেকে মুক্ত থাকার অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পেরেছি?

৩। আমরা কি লৌকিকতামুক্ত আমল করতে পেরেছি? অর্থাৎ মানুষকে খুশি করার জন্য নয় কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য কাজ করতে পেরেছি?

৪। আমরা কি প্রবৃত্তির সুপ্ত লালসা ও বাসনামুক্ত আমল করতে পেরেছি?

৫। আমাদের নামায, রোযা ও সদকা-খয়রাত ও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার, মানবসেবার যাবতীয় কাজ বা ঐশী জামাতের কাজে প্রদত্ত সময় কি কেবল আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছিল? নাকি এসব নিছক লৌকিকতা এবং মানুষকে খুশি করার জন্য আমরা করেছি?

৬। আমাদের মনের সব সুপ্ত-বাসনা খোদাপ্রাপ্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি তো?

৭। গত বছরটি আমরা কি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা পরিহার করে এবং সত্যে অবিচল থেকে অতিক্রান্ত করেছি?

৮। আমরা কি নিজের ক্ষতিসাধন করে হলেও সর্বাবস্থায় সত্য বলার অভ্যাস রপ্ত করতে পেরেছি?

৯। মনের মাঝে নোংরা ও অশ্লিল চিন্তাধারার উদ্রেক করে– আমরা কি নিজেদেরকে এমন সব আয়োজন ও অনুষ্ঠান থেকে বিরত রেখেছি?

১০। টিভি, ইন্টারনেটে পরিবেশিত অথবা এমনসব অন্যান্য অনুষ্ঠান যেগুলো দেখলে অন্তরে নোংরা চিন্তাধারা জন্ম নেয় আমরা কি এসব পরিহার করতে পেরেছি? (যদি এর উত্তর 'না' হলে আমাদের অবস্থা বড়ই করুণ)

১১। আমরা কি কুদৃষ্টি নিক্ষেপের বদঅভ্যাস পরিত্যাগ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি বা করে চলেছি?

১২। আমরা কি বিগত বছরে দুষ্কর্ম ও পাপাচারের যাবতীয় উপলক্ষ্য থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছি? [উল্লেখ্য, মহানবী(সা.) বলেছেন, মু'মিনকে গালি দেয়াও দুষ্কর্ম ও অবাধ্যতা বলে গণ্য।]

১৩। আমরা কি নিজ নিজ গণ্ডিতে সব ধরনের অত্যাচার-অনাচারের পথ পরিহার করতে পেরেছি?

১৪। আমরা কি সব ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পেরেছি?

১৫। আমরা কি সব ধরনের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি? [চরম দুরাচারী এবং পর-নিন্দুক ও পরচর্চাকারীকেও মহানবী(সা.) নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী আখ্যা দিয়েছেন।]

১৬। আমরা কি সব ধরনের বিদ্রোহ ও অবাধ্য আচরণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছি?

১৭। আমরা কি গত বছর নিজেদেরকে রিপুর তাড়না থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছি? (সর্বস্তরে অশ্লীলতা ও সর্বগ্রাসী নগ্নতার এ যুগে রিপুর তাড়না থেকে আত্মরক্ষা করাও একটি জিহাদ।)

১৮। আমরা কি গত বছর দৈনিক পাঁচ বেলার নামায বিনা ব্যতিক্রমে নিয়মিতভাবে আদায় করতে পেরেছি? (কেননা নামায পরিত্যাগ করা মানুষকে শিরক ও কুফরির নিকটবর্তী করে দেয়।)

১৯। আমরা কি বিগত বছরে যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ নামায পড়তে সচেষ্ট ছিলাম? [মহানবী(সা.) বলেছেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তে সচেষ্ট থেকো, কেননা এটি খোদা তা'লার পুণ্যবান বান্দাদের বৈশিষ্ট্য ও তাঁর নৈকট্যলাভের উত্তম পন্থা এবং এর অভ্যাস মন্দকর্ম থেকে বিরত রাখে ও পাপমোচন করে। দৈহিক রোগ-ব্যাধি থেকেও মানুষকে এটি রক্ষা করে।]

২০। আমরা কি হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর জন্য নিয়মিত বিনা ব্যতিক্রমে দরুদ পাঠ করেছি ও এখনও করে যাচ্ছি? (বিশ্বাসী মুমিনদের জন্য এটি আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ আদেশ আর দোয়া গৃহীত হবার একটি কার্যকর মাধ্যম।)

২১। আমরা কি নিয়মিত ইস্তেগফার করার অভ্যাস গড়ে তুলেছি?

২২। আমরা কি নিয়মিত আল্লাহ্‌র প্রশংসা গাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলেছি?

২৩। আপন-পর নির্বিশেষে যে কাজ কাউকে সামান্যতম কষ্ট দেয়– আমরা কি এমন আচরণ থেকে বিরত থাকতে পেরেছি?

২৪। আমাদের কথায় বা কাজে কেউ যেন আঘাত না পায়– আমরা কি এমনভাবে বছরটি কাটিয়েছি?

২৫। আমরা কি মানুষের প্রতি ক্ষমা ও মার্জনাসূলভ আচরণ করতে পেরেছি?

২৬। বিগত বছরে বিনয় ও নম্রতা কি আমাদের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল?

২৭। সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে বা বিপদে– সর্বাবস্থায় আমরা কি আল্লাহ্‌র সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছি?

২৮। বিপদাপদের সময় আমরা আল্লাহকে অভিযুক্ত করে ফেলি নি তো?

২৯। সামাজিক কদাচার ও প্রবৃত্তির মোহ থেকে আমরা কি নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি?

৩০। আমরা কি কুরআন শরীফ ও মুহাম্মদ(সা.)-এর নির্দেশাবলী ষোল আনা পালনে সচেষ্ট ছিলাম?

৩১। আমরা কি অহংকার ও আত্মম্ভরিতা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে পেরেছি?

৩২। আমরা অহংকার ও আত্মম্ভরিতা পরিহারের চেষ্টা করেছি কি? (কেননা শিরকের পর অহংকার ও আত্মম্ভরিতা হল সবচেয়ে বড় আত্মিক পাপ।)

৩৩। গত বছরটিতে আমরা কি উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী রপ্ত করার চেষ্টা করেছি?

৩৪। আমরা কি সহিষ্ণুতা ও বিনম্রতার বৈশিষ্ট অবলম্বন করতে সচেষ্ট থেকেছি?

৩৫। গত বছরের প্রতিটি দিন কি আমরা ধর্মসেবায় এবং এর সম্মান ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত করেছি?

৩৬। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গীকার আমরা করে থাকি তা সারশূন্য বা বুলি সর্বস্ব নয় তো?

৩৭। আমরা কি ধর্ম সেবাকে নিজেদের ধন-সম্পদের ওপর স্থান দিতে পেরেছি?

৩৮। আমরা কি ধর্মকে নিজ মান-সম্ভ্রমের চেয়েও বেশী মূল্য দিতে পেরেছি?

৩৯। আমরা কি ধর্মকে নিজ সন্তানদের চেয়েও প্রিয়তর জ্ঞান করতে পেরেছি?

৪০। আমরা কি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে সচেষ্ট ছিলাম?

৪১। আমরা কি আমাদের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত করতে সচেষ্ট ছিলাম?

৪২। আমরা কি নিজেদের মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য করার চেতনা চিরজাগরুক থাকার এবং এ চেতনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার জন্য দোয়া করেছি?

৪৩। আমরা কি নিজ সন্তান-সন্ততির মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য করার চেতনা চিরজাগরুক থাকার এবং এ চেতনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার জন্য দোয়া করেছি?

৪৪। হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর সাথে আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্বের ও আনুগত্যের সম্পর্ককে আমরা কি ক্রমান্বয়ে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছি যার তুলনায় জগতের সকল সম্পর্ক তুচ্ছ সাব্যস্ত হয়?

৪৫। আমরা কি গত বছর আহমদীয়া খেলাফতের সাথে নিবিড় ভালবাসা ও আনুগত্যের সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করেছি?

৪৬। আমরা কি নিজ সন্তান-সন্ততিদেরকে আহমদীয়া খেলাফতের সাথে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক গড়ার বিষয়ে বার বার মনোযোগ আকর্ষণ করেছি? আর এদিকে তাদের মন আকৃষ্ট হবার জন্য কি দোয়া করেছি?

৪৭। আমরা কি যুগ-খলীফা ও এ জামা'তের জন্য নিয়মিত দোয়া করেছি?

প্রকাশনায়: আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

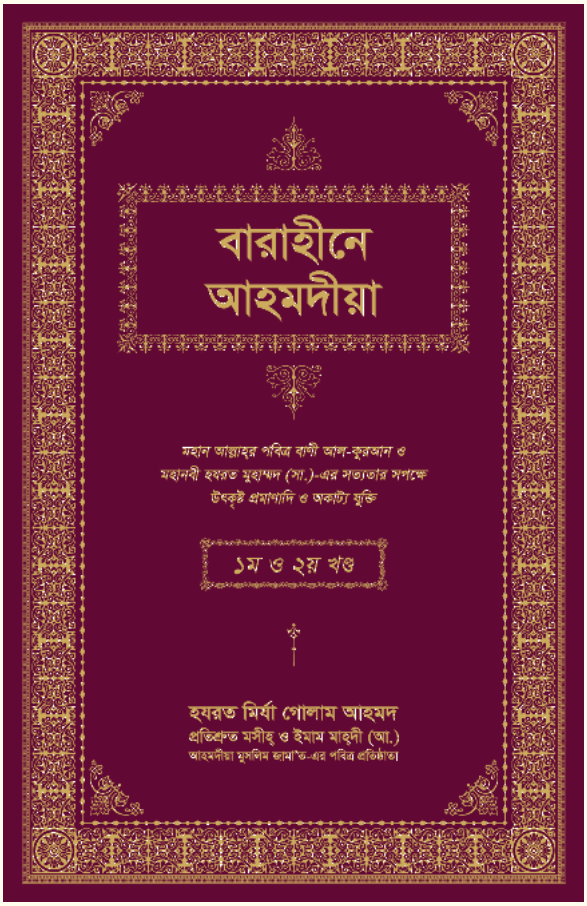

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশ হয়।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

Right Management Consultants
Software Developer & MIS Solution Provider
Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

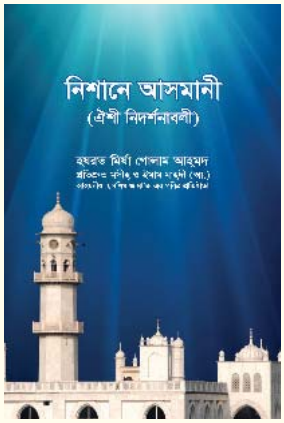

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'নিশানে আসমানী'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৬ সালে প্রণয়ন করেন।

এ বইটির মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঐ সব বুযূর্গের মধ্য হতে দুইজন বুযূর্গ মজযুব গোলাব শাহ্ এবং নেয়ামতউল্লাহ্ ওলী'র সেসমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন যা ইমাম মাহ্দী আগমনের লক্ষণাবলী ও সত্যতা প্রকাশ করে।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

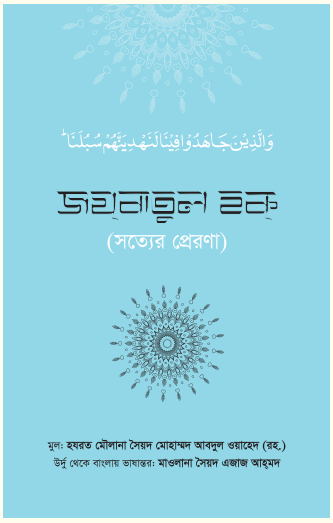

জয্বাতুল হক্ (সত্যের প্রেরণা) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রখ্যাত আলেম হযরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) সাহেবের আধ্যাত্মিকতার পথে মহাসংগ্রামের ধারাবাহিক বিবরণ। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে আত্মিক প্রশান্তির সাথে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফার হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তার নিজের লেখা বইটি (মূল উর্দু) ছাপাখানায় থাকা অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

পরবর্তীতে তার সুযোগ্য সন্তান মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে এখন তার উত্তরসূরিগণ পুনরায় যথাযথ অনুমোদন নিয়ে বইটি পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

আমরা আশা করি যারা এই বইটি পড়বেন তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভের প্রেরণা পাবেন। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

New Vol. No. 80 | 3rd & 4th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

31st August, 2017 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

একটু পড়েই দেখি-

"যারা খাবারের বিলটা সবসময়ই নিজে দিতে চায়, তার মানে এই নয় যে, তার টাকা উপচে পড়ছে। এর কারণ সে টাকার চেয়ে বন্ধুত্বকে বড় করে দেখে।"

"যারা আগে ভাগেই কাজ করে ফেলে, এর মানে সে বোকা নয়, আসলে তার দায়িত্বজ্ঞান রয়েছে।"

"যারা ঝগড়া বা বাক-বিতন্ডার পরে আগে মাফ চেয়ে নেয়, সে-ই ভুল ছিল এমনটি নয় বরঞ্চ সে চারপাশের মানুষকে মূল্যায়ন করে।"

"তোমাকে যে সাহায্য করতে চায় সে তোমার কাছে কিছু আশা করে না বরং একজন প্রকৃত বন্ধু মনে করে।"

"কেউ আপনাকে প্রায়ই টেক্সট করে তার মানে এটা নয় যে, তার কোন কাজ নেই, আসলে সে আপনাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে।"

"একদিন আমরা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো, কিন্তু আমাদের আচরণ ও ভালোবাসাগুলো মানুষের হৃদয়ে থেকে যাবে। কেউ না কেউ স্মরণ করবে, এ হচ্ছে সেই মানুষ যার সাথে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কিছু সময় কাটিয়েছি।"

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

"জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন 'আলা ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী"

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় বিকাল ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com